দ্য ম্যান হু কাউন্টেড

এক গাণিতিক অভিযাত্রার কাহিনি

মূল: মালবা তাহান

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

মালবা তাহান কে?

দ্য আলকেমিস্টের লেখক পাওলো কোয়েলহো তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “অ্যা গ্রেট স্টোরিটেলার।“

মালবা তাহান আসলে ব্রাজিলিয়ান লেখক হুলিও সিজার দা মেইয়ো এ সুজার ছদ্মনাম। হুলিও সিজার এই নামটি ব্যবহার করেই তাঁর অসাধারণ লেখাগুলোর বেশিরভাগ লিখেছেন।

...

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু

০১। মেধার মিলন

০২। যার ওপর আস্থা রাখা যায়

ভূমিকা

বাগদাদ। খলিফা হারুন অর রশিদের সময়কাল।

বইটি পড়লে একদিকে যেমন বাস্তব সমস্যা সমাধানে গণিতের দারুণ সব ব্যবহার পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে আব্বাসীয় খিলাফতের সময়কালের বাগদাদের দারুণ এক বিবরণ। সেসময় মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল, কেমন ছিল হাট-বাজার, কেমন ছিল ঘরবাড়ি ইত্যাদি বর্ণনাগুলো উঠে এসেছে গণিতের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।

০১

মেধার মিলন

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

আমার নাম হানাক তাদে মাইয়া। একবার বাগদাদের রাস্তা ধরে উটের পিঠে করে বাড়ি ফিরছিলাম ধীরগতিতে। এতদিন টাইগ্রিস নদীর তীরের সামারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। হঠাৎ দেখালাম, ভদ্র পোশাকের একজন মুসাফির একটি পাথরের ওপর বসা। ভ্রমণের ক্লান্তির ছাপ চোখে-মুখে।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাকে সালাম দিতে যাচ্ছিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "চৌদ্দ লক্ষ তেইশ হাজার সাত শ পয়তাল্লিশ।" এরপর দ্রুত করে বসে পড়ে নিরব হয়ে গেলেন। দুই হাতের ওপর মাথা রেখে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। থেমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। তাকে মনে হচ্ছিল অতীতের রূপকথার গল্প থেকে উঠে ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য।

একটু পর আবার দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ভাষায় সযত্নে আরেকটি বিশাল সংখ্যা আওড়ালেন, "তেইশ লক্ষ একুশ হাজার আট শ ছেষট্টি।"

আরও কয়েকবার দাঁড়িয়ে লোকটা এমন কিছু সংখ্যা উচ্চারণ করলেন। আবারও রাস্তার পাশের রুক্ষ পথরটার উপর বসলেন তিনি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি তার কাছে গেলাম। সালাম দিয়ে সংখ্যাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

"হে আগন্তুক," গণনাকারী বললেন, "আমার চিন্তা-ভাবনা ও হিসাবের অসুবিধা হলেও আপানার কৌতূহলকে এড়িয়ে যাব না। আপনি আমার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে কথা বলেছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণ করছি। তবে আগে আপনাকে আমার নিজের কাহিনি বলতে হয়।"

এরপর তিনি আমাকে নিজের কাহিনি শোনালেন। মজার গল্পটা আমি তাঁর কণ্ঠেই শোনাচ্ছি আপনাদের।

০২

যার ওপর আস্থা রাখা যায়

এ অধ্যায়ে

গণনাকারী তাঁর জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন। জানলাম তাঁর হিসাব করার বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। জানতে পারবেন কীভাবে আমরা একে অপরের সফরসঙ্গী হলাম।

আমার নাম বেরেমিজ সামির। পারস্যের খোই গ্রামে আমার জন্ম। পিরামিডের মতো দেখতে সুউচ্চ আরারাত পর্বতের ছায়ায় গ্রামটির অবস্থান। খুব ছোট থাকতেই আমি রাখালের কাজ শুরু করি। আমার মনিব ছিলেন খামাত অঞ্চলের একজন বিত্তশালী মানুষ।

"প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটলেই আমি বিশাল এক ভেড়ার পাল নিয়ে তৃণভূমিতে চলে যেতাম। আলো ফুরাবার আগেই আমাকে ফিরে আসতে হত। কোনো ভেড়া হারিয়ে গেলে কঠোর শাস্তির ভয় ছিল। এ ভয়ে আমি প্রতিদিন কয়েকবার সেগুলো গুণতাম।

"গণনায় আমি খুব দক্ষ হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে তো এক নজর দেখেই পুরো পাল গুণে ফেলতে পারতাম। গণনার চর্চার জন্যে আমি আকাশে ওড়া পাখির ঝাঁক গুণতাম। ক্রমেই এই শিল্পে আমি কুশলী হয়ে উঠতে থাকলাম। আমি পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকামাকড় গুণতে থাকলাম। কয়েক মাস পরে দারুণ এক অর্জন হয়ে গেল আমার। একটি মৌছাকের সব মৌমাছি গুণে ফেললাম আমি। এই কৃতিত্ব অবশ্য আমার পরের অর্জনগুলোর তুলনায় কিছুই নয়।

“কিছুটা দূরের অঞ্চলে আমার সহৃদয় মনিবের কিছু মরুদ্যান ছিল। যেখানে ছিল সুবিশাল খেজুর বৃক্ষসারি। আমার গাণিতিক প্রতিভার কথা মনিব জেনেছিলেন। এবার তিনি আমাকে খেজুর বিক্রির দায়িত্ব দিলেন। সেগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে একটি একটি করে গুণতাম আমি। এভাবে খেজুর গাছের তলায় আমার দশ বছর কাটল। মনিবের প্রচুর লাভ হলো। খুশি হয়ে তিনি আমাকে চার মাসের অবকাশ দিলেন। এখন আমি বাগদাদ যাচ্ছি। সেখান আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করব। আর দেখব সেখানকার সুন্দর সুন্দর মসজিদ ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলো।

“সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচতে আমি ভ্রমণ করতে করতে এই অঞ্চলের খেজুর গাছগুলো গুণেছি। গুণেছি সেই ফুলগুলো যেগুলোর ঘ্রাণে এই পথ বিমোহিত হয়ে আছে। সে পাখিগুলো যেগুলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পাখা মেলে উড়ছে। “

কাছের একটি ডুমুর গাছ দেখিয়ে তিনি বললেন, “এই যেমন এই গাছটির কথাই ধরুন। এতে দুই শ চুরাশিটি ডাল আছে। প্রতি ডালে গড়ে তিন শ সাতচল্লিশটি পাতা থাকলে, সহজেই হিসাব করা যায়, এতে মোট আটানব্বই হাজার পাঁচ শ আটচল্লিশটি পাতা আছে। তাই না, বন্ধু?”

“অসাধারণ!” আমার কণ্ঠে বিস্ময়। “এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে একজন মানুষ একটি গাছের দিকে এক নজর তাকিয়ে সবগুলো ডালের সংখ্যা বলতে পারে। বাগানের সব ফুলের সংখ্যা বলতে পারে। এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে যে কেউই অনেক টাকার মালিক হতে পারে।“

“আপনার কি তাই মনে হয়?” বেরেমিজ বললেন। “আমার কখনও মনে হয়নি, লক্ষ পাতা ও মৌমাছি গুণে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। একটি গাছে কয়টি ডাল আছে তা কার কী কাজে লাগবে? আকাশের একটি পাখির ঝাঁকে কয়টি খেচর উড়ছে তাই বা কে টাকা দিয়ে জানতে চাইবে?”

“আপনার বিস্ময়কর প্রতিভা,” আমি ব্যাখ্যা করলাম, “কুড়িটা আলাদা উপায়ে কাজে লাগানো সম্ভব। কনস্টান্টিনোপাল বা এমনকি বাগদাদের মতো বিশাল রাজধানীতে আপনি সরকারকে অপরিসীম সহায়তা করতে পারেন। আপনি মানুষ, সেনাবাহিনি ও পশুর পাল গুণতে পারবেন। দেশের সম্পদের হিসাব করা আপনার জন্যে সহজ। দেশের উৎপাদন, কর, পণ্য ও দেশের সব অর্থের হিসাব-নিকাশ আপনি করে ফেলতে পারবেন। আমার বাড়ি বাগদাদে। সে সুবাদে আমি আমার পরিচিতি কাজে লাগিয়ে আমি আমাদের শাসক ও মনিব খলিফা আল-মুতাসিমের দরবারে আপনার জন্যে কোনো পদের ব্যবস্থা করে ফেলার আস্থা দিতে পারি। আপনি কোষাধ্যক্ষ হতে পারেন। অথবা মুসলমানদের পারিবারিক বিষয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।“

“ঠিক আছে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম।“ বললেন গণনাকারী। “আমি বাগদাদেই যাচ্ছি।“

আর কথা না বাড়িয়ে তিনি আমার পেছনে উটে উঠে বসলেন। একমাত্র উটের পিটে চেপে আমরা অপূর্ব সুন্দর বাগদাদ শহরের দিকে এগিয়ে চলছি। গাঁয়ের পথে হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটা সেই লোক সেই থেকে হয়ে গেলেন আমার বন্ধু ও সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বেরেমিজ খুব হাসিখুশী মানুষ। কথা বলেন খুব। বয়সটা বেশি নয় (তখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয়নি)। তিনি ছিলেন প্রানোচ্ছ্বল বুদ্ধিমত্তার আশির্বাদপুষ্ট। ছিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য জানার ছিল দুর্বার নেশা। খুব সাদামাটা ঘটনা থেকেও তিনি অন্যদের জন্যে অসম্ভব তুলনা বের করে আনেন। যা তাঁর গাণিতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি গল্প ও কাহিনি বলতেও পারদর্শী। সেজন্যে তাঁর কথাবার্তা শুনতে অদ্ভুত হলেও আকর্ষণীয়।

কখনও কখনও তিনি কয়েক ঘণ্টা চুপ হয়ে বসে থাকতেন। একটুও শব্দ করতেন না। মনে মনে কিন্তু চলছে কড়া হিসাব-নিকাশ। এ সময়গুলোতে আমার কষ্ট হলেও তাকে বিরক্ত করতাম না। তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিতাম। হয়ত ঐ সময়েই এই মেধাবী মনন থেকে বেরিয়ে আসবে গণিতের

প্রাচীন কোনো রহস্যের অপূর্ব আবিষ্কার। যে বিজ্ঞানকে আরবরা উন্নত করেছে ও তাতে নতুন অবদান যোগ করেছে।

০৩

বোঝাবাহী পশু

এ অধ্যায়ে

৩৫টি উট বন্টনের কাহিনি, যেগুলোকে তিন আরব ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যেভাবে গণনাকারী বেরেমিজ সামির আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব সেই ভাগটি করলেন, যার ফলে তর্করত তিন ভাই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। যেভাবে এর ফলে আমাদেরও লাভ হলো।

একটানা কয়েক ঘণ্টা চললাম আমরা। হঠাৎ করে বলার মতো একটা ঘটনা ঘটল। আমার সহযাত্রী বেরেমিজ এবার দক্ষ বীজগাণিতিকের মতো তাঁর মেধার প্রতিফলন দেখালেন।

একটি পুরনো ও অর্ধ-পরিত্যক্ত সরাইখানার কাছে তিনজন মানুষকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করতে দেখলাম। পাশেই কতগুলো উট দাঁড়িয়ে আছে। রাগে তিনজনের মুখ লাল হয়ে আছে। শোনা গেল তাদের কথা:

“না, তা হতে পারে না।“

“এ তো ডাকাতি!”

“কিন্তু আমি তো রাজি নই তাতে!”

বুদ্ধিমান বেরেমিজ তাদেরকে তর্কের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

“আমরা তিনজন সহোদর।“ বড়জন বলল। “উত্তরাধিকার সূত্র ৩৫টি উট পেয়েছি আমরা। বাবার ইচ্ছা অনুসারে এগুলোর অর্ধেক পাব আমি। তিন ভাগের এক ভাগ পাবে আমার ভাই হামিদ। আর নয় ভাগের এক ভাগ পাবে ছোট ভাই হারিম। কিন্তু আমরা ভাগটা করতে পারছি না। কেউ কিছু বললেই বাকি দুজন প্রতিবাদ করে। এ পর্যন্ত যত সমধান এসেছে তার কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ৩৫-এর অর্ধেক ১৭.৫। তিন ভাগ বা নয় ভাগের একভাগও তো ভাল কোনো সংখ্যা নয়। তাহলে কীভাবে ভাগ হবে?”

“খুব সোজা,” বললেন গণনাকারী। “আমি সঠিকভাবে ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদের ৩৫টি উটের সাথে আমার সুদর্শন উটটিও যোগ করলাম।“

কিন্তু আমি বাধ সাধলাম, “এমন পাগলামি আমি মানি না। উট ছাড়া আমরা সফর করব কীভাবে?”

“চিন্তা করো না, বাগদাদের বন্ধু,” বেরেমিজ কানে কানে বলল, “আমি যা করছি জেনে-বুঝেই করছি। তোমার উটটা দাও। দেখোই না কী করি।“

তাঁর কথার আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ দেখে আমি আর দ্বিধা না করে আমার সুন্দর উটটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। এবার একে তিন ভাইয়ের উটের সাথে যোগ করা হলো।

“বন্ধুগণ,” তিনি বললেন, “আমি একটি ন্যায় বণ্টন ও সঠিক বিভাজন করব। এখন আমাদের কাছে উট আছে ৩৬টি।“

বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “আপনার উট পাওয়ার কথা ৩৫-এর অর্ধেকসংখ্যক। মানে ১৭.৫। আমি আপনাকে দেব ১৮টি। এতে

আপনার আপত্তি করার কিছুই নেই, কারণ আপনি প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পাচ্ছেন। “

দ্বিতীয় ভাইকে তিনি বললেন, “হামিদ, আপনার পাওয়ার কথা ৩৫-এর তিন ভাগের এক ভাগ। মানে ১১টির ভগাংশ পরিমাণ বেশি। এখন আপনি পাবেন ১২টি। আপনার কিছু বলার কথা নয়, আক্রুণ আপনি বেশিই পেয়েছেন।“

এবার তিনি ছোটভাইয়ের দিকে ঘুরলেন, “হারিম নামির, আপনার বাবার ইচ্ছা অনুসারে আপনি পাচ্ছেন ৩৫-এর নয় ভাগের এক ভাগ, যাতে ৩টা ও আরেকটার কিছু অংশ হয়। কিন্তু আমি পুরো ৪টি উট দিলাম। আপনিও প্রাপ্যের চেয়ে বেশিই পেয়েছেন বলে আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।“

এবার তিনি বলে গেলেন, “আমার বণ্টনে সবাই লাভবান হয়েছেন। বড় ভাই পেছেন ১৮টি উট, পরের ভাই পেয়েছেন ১২টি, আর ছোটভাই ৪টি। ১৮ + ১২ + ৪ = ৩৪টি উট বণ্টন হয়েছে। ২টি উট বাকি থাকল। এর একটি আমাদের বাগদাদী বন্ধুর উট। আমি সমস্যাটি সমাধান করে দিয়েছি বলে আরেকটি উট আমাকে দিতে পারেন চাইলে।“

“হে আগন্তুক, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ।“ বড় ভাইর কণ্ঠে প্রশংসা। “আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনই হয়েছে। আমরা আপনার সমাধান গ্রহণ করলাম।“

বুদ্ধিমান গণনাকারী বেরেমিজ পাল থেকে ভাল একটু উট নিলেন। আমার উটের লাগাম তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন, “বন্ধু, চলো, আরাম ও তৃপ্তির সাথে যাত্রা শুরু করি। এখন আমার কাছেও উট আছে।“

আমরা বাগদাদের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম।

০৪

চিন্তার জন্যে খাবার

এ অধ্যায়ে

এক ধনী শেখের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল। আমাদের আট টুকরো রুটি সম্পর্কে সে যে প্রস্তাব দিল। আমাদের পাওয়া আটটি মুদ্রার বণ্টন যে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। বেরেমিজের তিন ধরনের ভাগ পদ্ধতি: সরল, প্রকৃত ও নিখুঁত বিভাজন। গণনাকারীর প্রতি মহান উজিরের প্রশংসা।

তিন দিন পরের কথা। আমরা সিপ্পুর নামে ছোট একটি ধ্বংসপ্রায় গ্রামের কাছাকাছি হলাম। দেখলাম, হাত-পা মাটিয়ে ছড়িয়ে একজন উসাফির বসা। জামা-কাপড় ছেঁড়া-ফাটা। গায়ে ভাল আঘাতও আছে। অবস্থা খুব নাজুক। হতভাগ্য মানুষটার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম আমরা। তিনি পরে আমাদেরকে তার দূর্ভাগ্যের গল্প শোনালেন।

তার নাম সালিম নাসির। বাগদাদের অন্যতম বিত্তশালী বণিক। কয়েক দিন আগে বসরা থেকে আল-হিল্লাহ যাওয়ার পথে পারসিক মরু ডাকাত তার কাফেলাকে হামলা ও লুট করে। প্রায় সবাই তাদের হাতে মারা পড়েছে। তিনি ছিলেন কাফেলার নেতা। বালুর মধ্যে অন্যান্য লাশের মধ্যে লুকিয়ে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান।

দুঃখের কাহিনি শেষ করে কাঁপাকাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের কাছে কি খাওয়ার কিছু হবে? আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি।“

“আমার কাছে রুটির তিনটে টুকরো আছে।“ আমি উত্তর দিলাম।

“আমার কাছে আছে পাঁছটা।“ বলেন গণনাকারী।

“খুব ভাল,” বললেন শেখ। “আমাকে একটু দেওয়া যাবে কি? আমি এর প্রতিদান দেব আপনাদেরকে। বাগদাদে পৌঁছলে আমি রুটির বদলে আট টুকরো স্বর্ণ দেব।“

আমরা তাই করলাম।

পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আমরা প্রাচ্যের মুক্তো, বিখ্যাত বাগদাদ শহরে প্রবেশ করলাম। কর্মব্যস্ত চত্বর পার হতেই সুন্দর পোশাকের একদল মানুষ আমাদের সামনে পড়ল। অভিজাত পিঙ্গল বর্ণের এক ঘোড়ায় চেপে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অন্যতম ক্ষমতাশালী উজির ইব্রাহিম মালুফ। আমাদের সাথে শেখ সালিম নাসিরকে দেখে তিনি বহর থামালেন। শেখকে বললেন, “কী হয়েছে তোমার, বন্ধু?” কেন তুমি ছিন্ন পোশাকে দুই আগন্তুকের সাথে বাগদাদে এসেছ?”

হতভাগা শেখ ভ্রমণের আদ্যোপান্ত তুলে ধরলেন। আমাদের প্রশংসা করলেন পঞ্চমুখে।

“এখনই এদের দাম দিয়ে দাও, “উজির নির্দেশ দিলেন। পকেট থেকে আটটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে সালিম নাসিরকে দিলেন। তাকে বললেন, “আমি এক্ষুণি তোমাকে দরবারে নিয়ে যাব। বিশ্বাসীদের রক্ষক নতুন এই মরু ডাকাতদের কথা অবশ্যই জানতে চাইবেন, যারা খলিফা এলাকার ভেতরেই আমাদের বন্ধুদের আক্রমণ করে মালামাল লুটে নেয়।“

এরপর সালিম নাসির বললেন, “বন্ধুগণ, তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তাহলে। তোমাদের সাহায্যের জন্যে আবারও ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের মূল্য দিতে চাই।“

গণনাকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই নাও তোমার পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা, পাঁচ টুকরো রুটির জন্য।“

“আর হে বাগদাদের বন্ধু, এই নাও তোমার তিনটি স্বর্ণমুদ্রা।“ বললেন আমাকে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে গণনাকারী সশ্রদ্ধ আপত্তি জানালেন। “মাফ করবেন, শেখ, এই বণ্টনকে দেখে সরল মনে হলেও গাণিতিকভাবে ভুল। আমি পাঁচ টুকরো রুটি দিয়েছে হিসেবে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া উচিত। আমার বন্ধু, যে তিনটি টুকরো দিয়েছে, তার পাওয়া উচিত একটি স্বর্ণমুদ্রা।“

“বলো কী!” উজিরও আকাশ থেকে পড়লেন। কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন, “এমন অদ্ভুত ভাগের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে?”

গণনাকারী মন্ত্রীর কাছাকাছি হলেন। বললেন:

“জি, আমি দেখাচ্ছি। আমার কথা গাণিতিকভাবে সঠিক। সফরের সময় আমাদের খিদা লাগলে আমি এক টুকরো রুটি নিলাম। একে তিন ভাগ করে সবাই এক ভাগ করে খেলাম। এভাবে আমার পাঁচটি টুকরো পনের খণ্ড হলো, ঠিক? আমার বন্ধুর তিন টুকরো হলো নয় খণ্ড। মোট খণ্ড হলো চব্বিশটি। আমার পনের খণ্ড থেকে আমি খেয়েছি আট খণ্ড। ফলে আমি আসলে দান করেছি সাত খণ্ড। আমার বন্ধুও খেয়েছে আট খণ্ড। আর দান করেছে নয় খণ্ড। ফলে সে আসলে দান করেছে এক খণ্ড। আমার দান করা সাত খণ্ড আর আমার বন্ধুর এক খণ্ড নিয়ে মোট আট খন্ড খেলেন শেখ। অতএব ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এটাই যে আমি পাব সাতটি মুদ্রা আর আমার বন্ধু পাবে একটি মুদ্রা।“

উজির গণনাকারীর ভীষণ প্রশংসা করলেন। তাঁর হিসাব অনুসারেই মুদ্রাগুলো ভাগ করে দিতে আদেশ দিলেন। গণিতবিদের প্রমাণটি ছিল যুক্তিসঙ্গত, নিখুঁত ও অকাট্য।

তবে এই বণ্টন যতই ন্যায়ানুগ হোক, বেরেমিজের নিজের তা পছন্দ হয়নি। উজিরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এই ভাগ, যেখানে আমি সাতটি মুদ্রা পাচ্ছি আর আমার বন্ধু একটি পাচ্ছে, এটা গাণিতিকভাবে সঠিক হলেও আল্লাহর কাছে এটি সুন্দর নয়।“

মুদ্রাগুলো একত্র করে তিনি সমান দুই ভাগ করলেন। এক ভাগ নিজে রেখে আরেক ভাগ আমাকে দিয়ে দিলেন।

“ইনি এক অসাধারণ মানুষ।” বললেন উজির। তিনি আট কয়েনের বণ্টন মেনে নেননি। প্রমাণ করলেন তিনি পাবেন সাতটি আর তার বন্ধু পাবেন একটি। পরে কী করলেন? সমান দুই ভাগ করেও বন্ধুকেও সমান অংশ দিলেন।“

“এই যুবকটি শুধু জ্ঞানী আর দক্ষ গণিতবিদই না, একজন উদারচিত্তের বন্ধুও বটে। আজ থেকেই তাঁকে আমার সচিব নিয়োগ করলাম।“

“সম্মানিত উজির,” বললেন গণনাকারী, “দেখলাম, আপনি ৫৬ অক্ষরে আমার শোনা সবচেয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তোমার মঙ্গল ও হেফাজত করুন।“

আমার বন্ধুর দক্ষতার কারিশমা শব্দ ও অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন ঈর্ষণীয় মেধায় আমরা সবাই চমকপ্রদ হলাম।

০৫

কথায় এত শব্দ

এ অধ্যায়ে

সোনালী হংসী নিবাসে যাওয়ার পথে বেরেমিজ সামির যেসব অসাধারণ হিসাব-নিকাশ করেছেন। আমাদের পুরো ভ্রমণে যতগুলো শব্দ ও গড়ে মিনিটে যত শব্দ ব্যবহার করেছেন। কীভাবে তিনি একটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

শেখ নাসির ও উজির মালুফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোনালী হংসী নামে একটি মুসাফিরখানায় উঠলাম। এটা সুলাইমান মসজিদের পাশেই অবস্থিত। সেখানে কাছের পরিচিত এক উটচালকের কাছে আমাদের উটগুলো বিক্রি করলাম।

পথিমধ্যে আমি বেরেমিজকে বললাম, “দেখেছো বন্ধু, আমি বলেছি না, তোমার মতো এমন গুণতে ওস্তাদ মেধাবী বাগদাদে সহজেই চাকরি পেয়ে যাবে। তুমি আসতে না আসতেই তারা তোমাকে উজিরের সচিবের পদ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দিল। এখন আর তোমাকে খোই গ্রামের বিষণ্ণ ও পাথুরে জায়গায় ফিরে যেতে হবে না।

গণনাকারী বললেন, “এখানে হয়ত আমি উন্নতি করতে পারব। ধনী হব। কিন্তু আবার একদিন পারস্য ফিরে গিয়ে আমি আমার স্বদেশকে দেখতে চাই। সে তো এক অকৃতজ্ঞ যে এক মরুদ্দ্যানে উন্নতি ও সুবিধা পেয়ে গিয়ে নিজের দেশ ও শৈশবের বন্ধুদের ভুলে যায়।“

আমার বাহুতে হাত রেখে তিনি বললেন, “আমরা ঠিক একদিন একসঙ্গে চলেছি। এই সময়ে বিভিন্ন জিনিস ব্যাখ্যা ও আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে আমি ঠিক ৪,১৪,৭২০ টি শব্দ উচ্চারণ করেছি। আট দিনে ১১,৫২০ মিনিট হয়। অতএব, সহজেই হিসাব করা যায়, এই ভ্রমণের সময় আমি গড়ে প্রতি মিনিটে ৩৬টি শব্দ বলেছি। মানে ঘণ্টায় ২,১৬০ শব্দ। সংখ্যাগুলো বলছে, আমি কম কথা বলেছি। আমি কথা বলেছি সতর্কতার সাথে। অর্থহীন আলাপ করে তোমার সময় নষ্ট করিনি। অল্প কথার ও অনেক বেশি নিরব মানুষ অনাকর্ষণীয় প্রাণীতে পরিণত হন। আবার যারা অনর্গল কথা বলে যেতেই থাকে তারা সঙ্গীকে বিরক্ত করে ফেলেন। অতএব, অর্থহীন আলাপ পরিহার করা উচিত। আবার মুখ বন্ধ করে রেখে সোজন্যহীনও হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটি ঘটনা বলব।“

একটু দম নিয়ে গণনামানব শুরু করলেন:

“পারস্যের তেহরানে এক বৃদ্ধ বণিকের তিন ছেলে ছিল। একদিন বণিক তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘যে অর্থহীন কথা না বলে সারাদিক কাটাতে পারবে পুরস্কার হিসেবে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেব।‘

“রাতের বেলা তিন ছেলেই বৃদ্ধ বাবার শিয়রে হাজির হলো। বড় ছেলে বলল, ‘বাবা, আমি সব ধরনের অর্থহীন বাক্যালাপ থেকে বিরত থেকেছি। আমার আশা, আমিই সেজন্যে প্রতিশ্রুত পুরস্কারটি পাব। আপনার নিশ্চয় মনে আছে ২৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেবেন বলেছিলেন।‘

“দ্বিতীয় ছেলেও আসল। বাবার হাত চুম্বন করে বলল, ‘শুভ সন্ধ্যা, বাবা।’

“সর্বকনিষ্ঠ ছেলে কোনো কথাই বলল না। বাবার কাছে এসে হাত প্রসারিত করে পুরস্কার তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত করল। বণিক তিন ছেলেরই আচরণ দেখলেন। বললেন, ‘বড় ছেলে আমার কাছে এসে নানান ধরনের অর্থহীন কতা বলে আমার মনযোগ হারিয়ে ফেলল। ছোট ছেলে অতিমাত্রায় অল্পভাষী। অতএব, পুরস্কার পাবে দ্বিতীয় ছেলে। সে সতর্কতার সাথে কথা বলেছে। বাগাড়ম্বর করেনি। সরল আচরণ করেছে। দম্ভ দেখায়নি।‘ ”

গল্প শেষ করে বেরেমিজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি মনে হয় বৃদ্ধ লোকটি ছেলের সাথে সঠিক আচরণ করেছে?”

আমি জবাব দিলাম না। ভাবলাম, এই বিস্ময়কর মানুষটার সাথে ২৩টি মুদ্রা নিয়ে আলাপ না করাই ভাল। তিনি তো সবসময় সবকিছুকে সংখ্যায় পরিণত করেন। গড় বের করেন। সমস্যা সমাধান করেন।

একটু পর আমরা সোনালী হংসীতে পৌঁছলাম। মুসাফিরখানার পরিচালকের নাম সালিম। একসময় বাবার হয়ে কাজ করতেন। আমাকে দেখে হাসলেন, আবার কাঁদলেন, “খোকা, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। এখন ও সবসময় তোমার ইচ্ছা পূরণে আমি প্রস্তুত।“

তাকে বললাম, আমার ও আমার গণনাকারী বন্ধু উজিরের সচিব বেরেমিজ সামিরের জন্যে কক্ষ প্রয়োজন।

সালিম জিজ্ঞেস করল, “ইনি একজন গণিতবিদ? তাহলে আমাকে একটি কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে একদম ঠিক সময়েই এসেছেন তিনি। এক স্বর্ণকারের সাথে এইমাত্র আমার তর্ক হলো। অনেক তর্কের পরেও আমরা সমস্যাটির সমাধান করতে পারিনি।”

মুসাফিরখানায় মহান এক গণিতবিদের আগমন ঘটেছে শুনে বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষের সমাগম হয়েছে। স্বর্ণকারকে ডেকে আনা হলো। সেও সমস্যার সমাধানে দারুণ ইচ্ছুক।

“সমস্যাটা কী?” জিজ্ঞাসা বেরেমিজের।

“এই লোকটা,” স্বর্ণকারকে দেখিয়ে বৃদ্ধ সালিম বললেন, “সিরিয়া থেকে বাগদাদ এসেছে দামী রত্নপাথর নিয়ে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সব রত্ন ১০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে থাকার খরচ হিসেবে ২০ দিনার দেবে আমাকে। আর ২০০ দিনারে বিক্রি করতে পারলে ৩৫ দিনার দেবে। কয়েকদিনের চেষ্টার পরে সে সবগুলো রত্ন ১৪০ দিনারে বিক্রি করেছে। এখন আমাকে কত দেওয়া উচিত?”

“২৪.৫ দিনার! এটাই সঠিক হিসাব। ” সিরিয়ানের জবাব। “২০০ দিনারে বিক্রি করলে যদি ৩৫ দিনার দেওয়া লাগে, তাহলে তার দশ ভাগের এক ভাগ প্রতি ২০ দিনারের জন্য আমাকে দিতে হবে ৩.৫ দিনার। এখন, তোমরা জানো, আমি রত্ন বিক্রি করে ১৪০ দিনার পেয়েছি, যা আমার হিসাব মতে ২০ এর ৭ গুণ। অতএব, রত্নগুলো ২০ দিনারে বিক্রি করলে ৩.৫ দিনার ভাড়া দিতে হলে ১৪০ দিনারে বিক্রি করলে ভাড়া হবে ৭ গুণ ৩.৫। মানে ২৪.৫ দিনার।“

২০০: ৩৫ :: ১৪০:ক

$$\text{ক} = \frac{\text{৩৫}\times\text{১৪০}}{\text{২০০}} = \text{২৪.৫}$$

“তুমি ভুল বলেছো,” বৃদ্ধ সালিম রেগে বললেন। “আমার হিসাব মতে আমি ২৮ দিনার পাব। শোনো! ১০০ দিনারে বিক্রি হলে আমি পেতাম ২০ দিনার। ১৪০ দিনারের জন্যে তাহলে পাব ২৮ দিনার। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

“১০০ দিনারের জন্যে ২০ দিনার পেলে এর দশ ভাগের এক ভাগ ১০ দিনারের জন্যে পাব ২ দিনার করে। ১৪০ হলো ১০-এর ১৪ গুণ। তাহলের ১৪০ দিনারের জন্য পাব ১৪ গুণ ২ দিনার। মানে ২৮ দিনার।

১০০: ২০:: ১৪০: ক

$$\text{ক} = \frac{\text{২০} \times \text{১৪০}}{\text{১০০}} = \text{২৮}$$

“অতএব, আমাকে ২৮ দিনার দিতে হবে।“ বৃদ্ধ সালিমের কণ্ঠে উত্তেজনা।

“শান্ত হও তোমরা,” গণনাকারী বললেন। “মাথা ঠাণ্ডা রেখে হিসাব করতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে রাগ আর ভুল হয়। তোমাদের দুজনের হিসাবই ভুল। আমি দেখাচ্ছি।“

“কথা ছিল, ১০০ দিনারে রত্ন বিক্রি হলে হলে ভাড়া হবে ২০ দিনার আর ২০০ দিনারে বিক্রি হলে ৩৫ দিনার। মানে এ রকম:

বিক্রয় মূল্য	ভাড়া
২০০	৩৫
-১০০	-২০
১০০	১৫

“দেখতেই পাচ্ছো, বিক্রয়মূল্যে ১০০ দিনারের পার্থক্য হলে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। বুঝতে পেরেছো?”

“একদম পরিষ্কারভাবে বুঝেছি।“ দুজনই বলল সমস্বরে।

“তাহলে,” গণিতবিদ বলে গেলেন, “বিক্রয়মূল্য ১০০ দিনার বাড়লে ভাড়ার পার্থক্য হয় ১৫ দিনার। তাহলে বিক্রয়মূল্য ৪০ টাকা বাড়লে ভাড়া কত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত? ৪০ হলো ২০-এর দ্বিগুণ। ২০ হলো ১০০-এর ৫ ভাগের এক ভাগ। আবার ১৫ এর ৫ ভাগের এক ভাগ হলো ৩। তাহলে বিক্রয়মূল্য ২০ দিনার বাড়লে ভাড়া বাড়বে ৩ দিনার। তাহলে ৪০ দিনারের পার্থক্যের জন্যে ভাড়া বাড়বে ২০-এর দ্বিগুণ, মানে ৬ দিনার। অতএব, ১৪০ দিনারে রত্ন বিক্রি করায় ভাড়া হবে ২০ + ৬ = ২৬ দিনার।[১]

১০০: ১৫:: ৪০:ক

$$\text{ক} = \frac{\text{১৫} \times \text{৪০}}{\text{১০০}} = \text{৬}$$

“বন্ধুগণ, সংখ্যাকে দেখতে সরল হলেও অনেক সময় সেরা জ্ঞানীকেও কুপোকাত করে দিতে পারে। যে ভাগকে দেখে মনে হয় নিখুঁত তাও হতে পারে পারে ভুলে ভরা। হিসাবের অনিশ্চয়তা থেকেই আসে গণিতবিদের সম্মান। চুক্তি অনুসারে মুসাফিরখানাকে ২৬ দিনার দিতে হবে, ২৪.৫ নয়। “

“ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন,“ স্বর্ণকার মেনে নিলেন। “আমি বুঝতে পেরেছি, আমার হিসাব ছিল ভুল।“

তিনি বৃদ্ধ সালিমকে ২৬ দিনার বের করে দিলেন। আর একটি রত্নপাথরের আংটি তুলে দিলেন বেরেমিজের হাতেও। প্রকাশ করলেন কৃতজ্ঞতা। জড় হওয়া মানুষগুলো গণনাকারীর প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ পথ ধরল।

অনুবাদকের নোট

১। এটা আমরা আরেকভাবে বের করতে পারি। ১৪০ দিনারে কত ভাড়া হবে সেটা বের করতে হলে ১০০ এবং ২০০ দুই বিক্রয়মূল্যই মাথায় রাখা লাগবে। এখন দুটোর গড় করে ফেললে কেমন হয়? ৩৫ এবং ২০ এর গড় ২৬.৫। কিন্তু বিক্রয়মূল্য ১৪০ তো ১০০ এবং ২০০ থেকে সমান দূরে নয়।

কিন্তু গড় করে ফেললে তো দুটো সংখ্যা সমান গুরুত্ব পায়। অতএব কোন সংখ্যাকে কতটুকু গুরত্ব দেব তা ঠিক করতে হবে। ১০০ এবং ২০০ এর ব্যবধানকে ১০ ভাগ করি। ১৪০-এর আগে থাকে ৪ ভাগ আর পরে থাকে ৬ ভাগ। ১৪০ যেহেতু ১০০ এর বেশি কাছে, তাই ১০০কে (মানে ভাড়া ২০কে) বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে ২০-এর গুরুত্ব (পরিসংখ্যানের ভাষায় weight) হবে ৬, আর ৩৫ এর গুরুত্ব ৪। আর ওয়েট থাকা অবস্থায় গড় করতে ভাগ দিতে হবে মোট ওয়েট দিয়ে। তাহলেগড় $= \frac{২০\times৬+৩৫\times৪}{১০}$

০৬

সংখ্যা দিয়ে পরীক্ষা

এ অধ্যায়ে

উজির মালুফের সাথে সাক্ষাতের সময় আমাদের সাথে যা ঘটেছিল। আমাদের সাথে একজন কবির দেখা হয়, হিসাব-নিকাশের প্রতি যার আস্থা ছিল না। গণনাকারী এখানে বড় একটি কাফেলার উট গণনা করার একটি মৌলিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন। পাত্রীর বয়স ও উটের কানের সংখ্যার মধ্যে মিল স্থাপন করেছেন। বেরেমিজ দ্বিঘাত বন্ধুত্ব ও বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে জেনেছেন।

দ্বিতীয় নামাজের পরে আমরা তাড়াতাড়ি করে উজির ইব্রাহিম মালুফের বাসায় গেলাম। এখানে এসে দারুণ বিস্ময়াভিভূত হলাম। ভারী লোহার গেট পার হয়ে আমরা একটি সংকীর্ণ করিডোরে পা রাখলাম। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন কৃষাঙ্গ দাস। কাঁধে সোনার বাহুবন্ধনী। প্রাসাদের ভেতরের বাগানে প্রবেশ করলাম আমরা। অপরূপ সুন্দর বাগানটিতে দুই সারি কমলা গাছ ছায়া বিলিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে বিভিন্ন দিকে অনেকগুলো দরজা চলে গেছে। কোনো কোনোটা নিশ্চয় হেরেমের দিকে গেছে।

দুজন দাস ফুল তুলছিল। আমাদেরকে দেখে সরে গিয়ে পিলারের আড়ালে দাঁড়াল। উঁচু দেয়ালের ভেতর দিয়ে সরু একটি পথ দিয়ে আমরা একটি উঠোনে এসে পৌঁছলাম। উঠোনের ঠিক মধ্যখানে চমৎকার একটি ঝর্ণা। তিনটি ফোয়ারা পানি ছিটাচ্ছে। তিনটি তরল রেখা সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে।

দাসকে অনুসরণ করে আমরা উঠোন পার হয়ে খোদ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। সামনে পড়ল অনেকগুলো সুশোভিত কক্ষ। রূপার প্রলেপযুক্ত রং-বেরংয়ের দামী কাপড় ঝোলানো দেয়ালে। শেষ পর্যন্ত উজিরের সাথে দেখা হলো। বিশাল কুশনে বসে দুই বন্ধুর সাথে আলাপ করছিলেন তিনি।

একজনকে চিনলাম। শেখ সালেম নাসির। আমাদের মরু অভিযানের সহযাত্রী। আরেকজন ছোটখাট গোলগাল চেহারার মানুষ। চেহারায় দয়া ফুটে আছে। দাড়িতে হালকা পাক ধরেছে। জামা-কাপড় কেতাদুরস্ত। গলায় একটা চারকোণা পদক ঝুলছে। পদকের অর্ধেকটা দেখতে সোনালী হলুদ। বাকিটা ব্রোঞ্জের মতো কালো।

উজির মালুফ আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পদকধারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে প্রিয় কবি, ইনি হচ্ছে আমাদের মহান গণনাকারী। তাঁর সাথের তরুণ মানুষটি বাগদাদের বাসিন্দা। আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার পর আকস্মিকভাবে তার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ।“

সম্মানিত শেখকে আমরা ভক্তিভরে সালাম দিলাম। পরে আমরা জেনেছি, তাঁর সঙ্গী মানুষটি ছিলেন বিখ্যাত কবি আব্দুল হাজমিদ। যিনি খলিফা আল-মুতাসিমেরও কাছে বন্ধু। গলার পদকটি তিনি পেয়েছেন খলিফার কাছ থেকেই। কাফ, লাম ও আইন অক্ষর তিনটি ছাড়াই ৩০, ২০০ পঙতির কবিতা লেখার পুরস্কার এটি।

কবে হেসে হেসে বললেন, “বন্ধু মালুফ, এই পারস্যদেশীয় গণনাকারীর অপূর্ব ক্ষমতা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে।“ সংখ্যাকে মিশ্রিত করলে একটি চালাকি তৈরি হয়। যাকে বলা যায় বীজগাণিতিক চতুরতা। একবার মোদাদের পুত্র রাজা এল-হারিতের কাছে এক বিজ্ঞ মানুষ আসেন। তিনি নাকি বালু দেখে ভাগ্য বলতে পারেন। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি নিখুঁত হিসাব করতে পারো?’ বিস্ময়ের আবেশ কাটার আগেই তিনি বললেন, ‘নিখুঁত হিসাব করতে না পারলে আপনার সবগুলো পরিকল্পনা অর্থহীন; আপনি যদি নিছক হিসাবের মাধ্যমে সেগুলো করেন তবে সেগুলো আমি অবিশ্বাস করি।‘ ভারতে একটি প্রবাদ শিখেছি, ‘হিসাবকে সাতবার অবিশ্বাস করুন, আরে গণিতবিদকে এক শ বার।‘ “

উজির বললেন, “অবিশ্বাস দূর করার জন্যে আমাদের অতিথিকে চূড়ান্তভাবে একবার পরীক্ষা করা যাক।“ এটা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বেরেমিজের বাহু ধরে প্রাসাদের একদিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। জানালা খুলে আরেকটি উঠোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। সেখানে অনেকগুলো উটের সারি। সবগুলো ভাল জাতের। দেখলাম, দুটো কি তিনটে মঙ্গোলীয় সাদা উট। বাকিগুলো পশমহীন চামড়ার ক্যারেহ।

উজির বললেন, “দারুণ এই উটগুলো আমি গতকাল কিনেছি। আমি এগুলোকে উপহার হিসেবে আমার পুত্রবধুর বাড়িতে পাঠাতে চাই। আমি জানি এখানে ঠিক কতগুলো উট আছে। তুমি কি বলতে পারবে কতগুলো আছে?”

পরীক্ষাকে আরও কঠিন করতে উজির সাহেব উটগুলোর দিকে মুখ করে শিস দিলেন। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এখানে অনেক অনেক উট। তাও আবার ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। আমার বন্ধু ভুল করলেই আমাদের ভ্রমণের আনন্দ ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘুরে বেড়ানো উটের পালের দিকে চোখ বুলিয়ে আমার বন্ধু বেরেমিজ বললেন, “সম্মানিত উজির, আমার হিসাব বলছে, এখানে উট আছে ২৫৭টি।“

“একদম সঠিক!”উজির জানিয়ে দিলেন। “আল্লাহর কসম, দুইশন সাতান্নটিই উট আছে।“

“আপনি এত দ্রুত কীভাবে বললেন, তাও নিখুঁত করে?” কবির চোখে-মুখে এক সাগর কৌতূহল।

“খুব সহজ,“ বললেন বেরেমিজ। “একটা একটা করে উট গণনায় কোনো মজা নেই। তাই আমি প্রথমে খুরগুলো গুণলাম। পরে কানগুলো। মোট পেলাম ১৫৪১। সাথে যোগ করলাম ১। একে ৬ দিয়ে ভাগ করলাম। নিঃশেষে ভাগ হয়ে ২৫৭ হলো।“

“অসাধারণ,” উজির কণ্ঠে প্রশংসা। “কত মৌলিক চিন্তা! কে ভেবেছিল, নিছক মজা পাওয়ার জন্যে কেউ কান ও খুর গুণবে?”

“আমি বলব, “ বেরেমিজ বললেন, “মাঝেমাঝে গণনাকারীর উদাসীনতা বা অক্ষমতা হিসাবকে কঠিন করে তোলে। একবারের ঘটনা। আমি তখন খোই শহরে ছিলাম। আমি মনিবের পশুর পাল দেখছিলাম। এসময় এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে গেল। একজন রাখাল জিজ্ঞেস করল আমি সেগুলো গুণতে পারব কি না। ‘আট শ ছাপ্পান্ন,’ বললাম আমি। রাখাল বলল, ‘কী! আট শ ছাপ্পান্ন? এত বেশি?’ তখন আমি বুঝলাম, আমি প্রজাপতির বদলে গুণেছি পাখার সংখ্যা। দুই দিয়ে ভাগ দিতেই সঠিক সংখ্যা পেলাম।

শুনে উজির খুব মজা পেলেন। সঙ্গীতের মতো মিষ্টি সুরে হেসে উঠলেন।

“সবকিছুই বুঝলাম,” কবি বলছেন। “উটের সঠিক সংখ্যা পেতে চার খুর ও দুই কানের জন্য ৬ দিয়ে ভাগ দিতে হবে বুঝলাম। কিন্তু ১৫৪১ কে ৬ দিয়ে ভাগ দেওয়ার আগে ১ যোগ করতে হলো কেন?”

“খুব সহজ,” জবাব দিলেন বেরেমিজ। “কান গুণতে গিয়ে দেখলাম, একটি উটের একটি কান নেই। সে কারণেই ১ যোগ করে নিয়েছি।“

এবার বেরেমিজ উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেয়াদবি মাফ করলে জিজ্ঞেস করতাম, আপনার পুত্রবধুর বয়স কত?”

“না, না, অসুবিধা নেই।“ উজির বললেন, “আস্তিরের বয়স ষোলো।“ এবার তিনি সংশয় নিয়ে জানতে চাইলেন, “কিন্তু ওর বয়সের সাথে তো আমি যে উটগুলো উপহার পাঠাব সেগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক দেখছি না।“

“আমি শুধু ছোট একটি পরামর্শ দিতে চাই।“ বললেন বেরেমিজ। ত্রুটিযুক্ত উটটি পাল থেকে সরিয়ে নিলে উট থাকবে ২৫৬টি। যা ১৬-এর বর্গ। ১৬ গুণ ১৬ সমান ২৫৬। আস্তিরের বাবাকে পাঠানো উপহার তাহলে গাণিতিকভাবে নান্দনিক হবে। ২৫৬ কে ২-এর ঘাত আকারে প্রকাশ করা যায় ($২^{৮}$)। আর ২৫৭ হলো মৌলিক সংখ্যা। বর্গ সংখ্যার সাথে ভালাবাসা বেশি মিলে যায়। বর্গ সংখ্যা নিয়ে মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে। চাইলে শোনাতে পারি।“

“আনন্দের সাথেই শুনব,” বললেন উজির। “সুন্দর গল্প সুন্দর করে বললে শুনতেও সুন্দর লাগে। আমার শোনার কৌতূহল হচ্ছে।“

সৌজন্য প্রকাশ করে গণনাকারী শুরু করলেন, “বাদশা সুলাইমান (আ:) সম্পর্কে বলা হয়, সৌজন্য ও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাঁর বাগতত্তা, সুন্দরী রানি বিলকিসকে ৫২৯ টি মুক্তার একটি বাক্স উপহার দেন। ৫২৯ কেন? কারণ ৫২৯ হলো ২৩-এর বর্গ। মানে ২৩ গুণ ২৩ সমান ৫২৯। আর ২৩ ছিল রানির বয়স। তরুণী আস্তিরের বয়স ১৬। তাই ২৫৬ টি উট দেওয়া সুন্দর দেখায়।“

সবাই গণনাকারীর দিকে তাকাল বিস্ময় নিয়ে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, “১৬-এর বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলো যোগ করলে পাওয়া যায় ১৩। ১৩-এর বর্গ ১৬৯। ১৬৯-এর অঙ্কগুলোর যোগফল আবার ১৬। ফলে ১৩ ও ১৬ সংখ্যা দুটির মধ্যে দারুণ একটি সম্পর্ক আছে। একে আমরা বলতে পারি দ্বিঘাত সম্পর্ক। সংখ্যাদের বাকশক্তি থাকলে আমরা হয়ত তাদের আলাপ শুনতাম: ১৬ ১৩কে বলছে, ‘আমি তোমার প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমার বর্গ ২৫৬, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৩।‘ ১৩ উত্তরে বলছে, ‘তোমার সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ, প্রিয় বন্ধু। আমিও তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমার বর্গ ১৬৯, যার অঙ্কগুলোর যোগফল ১৬। ‘

“আমার মনে হয় ২৫৬’র পক্ষে আমি যথেষ্ট কারণ উল্লেখ করেছি। ২৫৭’র চেয়ে সংখ্যাটি অনেক অনেক সুন্দর। “

“তোমার বুদ্ধিটা খুব অনন্য,” উজির উত্তর দিলেন। “হ্যাঁ, এটাই করব আমি, যদিও মানুষ বলবে আমি সুলাইমানকে (আ) নকল করেছি। কবির দিকে ঘুরে উজির বললেন, “দেখছি এই মানুষটি গল্প যেমন বলতে পারেন, তেমনি বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলনাও টানতে পারেন। তাকে সচিব বানিয়ে তো ভালই করেছি।“

“সম্মানিতে উজির, আমি দুঃখিত,” বেরেমিজ বললেন, “আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি এক শর্তে। আমার বেকার ও নিঃস্ব বন্ধু হানাক তাদে মাইয়ারও একটি চাকরি প্রয়োজন। “

গণনাকারীর উদারতা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি এভাবে আমাকে উজিরের সামনে তুলে ধরবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।“

“আপনি উত্তম অনুরোধ করেছেন।“ উজির জানালেন। “আপনার বন্ধুকে নথিলেখকের দায়িত্ব দিচ্ছি। সাথে থাকবে যথাযোগ্য বেতন।“

উজির ও মহানুভব বেরেমিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি সাথে সাথে সম্মত হয়ে গেলাম।

০৭

চার চারের কারিশমা

আমাদের প্রথমবার বাজারের যাওয়ার গল্প। বেরেমিজ ও নীল পাগড়ির কাহিনি। চারটি চারের ঘটনা। পঞ্চাশ দিনারের সমস্যা। সমস্যার সমধান করে বেরেমিজের সুন্দর উপহার পাওয়ার গল্প।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। উজিরের অফিসের কাজ শেষ করে বাজার ও বাগদাদের বাগানে ঘুরতে বের হলাম। সেদিন বিকেলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কোলাহল ছিল। এর কারণ কয়েক ঘণ্টা আগেই দামেশক থেকে কিছু ধনী কাফেলা এসে পৌঁছেছে। কাফেলার আগমন ঘটলে সবসময় সবাই প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে উঠত। অন্য দেশে কী জিনিস তৈরি হচ্ছে তা জানার এটাই একমাত্র উপায়। ভিনদেশী ব্যবসায়ীদের সাথেও মেশার সুযোগ আসে এর মাধ্যমে।

জুতার বাজারে তো প্রবেশ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কী খালি জায়গা, কী দোকান–সর্বত্র নতুন নতুন পণ্যের বস্তা ও বাক্সের ছড়াছড়ি। দামেশকের লোকেরা বড় বড় রংবেরংয়ের পাগড়ি ও কোমরে অনুশীলনের অস্ত্র নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদাসীনভাবে দেখছে এ দোকান, সে দোকান। ধূপ, জর্দা ও মসলার তীব্র গন্ধ চারদিকে। সবজিবিক্রেতারা মারাত্মক রকম ঝগড়া করছে। অপমান করছে একে অন্যকে। মসুলের একজন তরুণ গিটারবাদক কিছু বস্তার উপর বসে বিমর্ষ ও একঘেয়ে সুরে গান গাইছে:

মানুষের জীবনের গুরুত্বই বা কী?

যদি মানুষ বেঁচে থাকে সম্ভাব্য সবচেয়ে সরলভাবে

সে ভাল বা খারাপ যাই হোক

আমার কথা এ পর্যন্তই

দোকানদাররা দোকানের সামনেও পণ্য সাজিয়ে রেখেছে। আরবদের উর্বর চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের অধিকার বেশি করে আদায় করছে।

“এই দেখুন, এই জামাটা একজন আমিরের গায়েই মানায়!”

“বন্ধুগণ, এই দারুণ সুগন্ধি আপনাকে স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দেবে।“

“হুজুর, এই চপ্পল ও এই কাফতান জুতাগুলো দেখুন। এগুলো জ্বিনেরা ফেরেশতাদেরকে উপহার দেয়।“

একটি রুচিশীল নীল পাগড়ি বেরেমিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কুঁজো এক সিরীয় লোক চার দিনারে সেটা বিক্রি করছিল। এই দোকানীর ঘরটাও ছিল একটু ব্যতিক্রমী। এখানের সবকিছু– পাগড়ি, বাক্স, খঞ্জর, চুড়ি ইত্যাদি– সবকিছুর দাম চার দিনার করে। উজ্জ্বল বর্ণে একটি ব্যানার লেখা।

এটা দেখে বেরেমিজ পাগড়িটা কিনতে আগ্রহী হলেন। বললাম, “এমন অপব্যয় পাগলামি ছাড়া কিছু না। আমাদের কাছে অল্প টাকা আছে। এখনও আমরা সরাইখানার ভাড়াও দেইনি।“

“আমার আকর্ষণ পাগড়ির দিকে নয়,” বেরেমিজ বললেন, “তুমি কি খেয়াল করেছো এই দোকানের নাম ‘চারটি চার?’ এই কাকতালীয় ঘটনার গুরুত্ব অস্বাভাবিক রকমের।”

“কাকতালীয় ঘটনা কেন?”

“এই দোকানের ক্যালকুলাসের একটি অসাধার বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। চারটি চার ব্যবহার করে আমরা যেকোনো সংখ্যায় পৌঁছতে পারি।“

বেরেমিজকে এর রহস্য জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা নরম বালুতে লিখে বোঝাতে শুরু করলেন।

“তুমি কি শূন্য চাও? এর চেয়ে সহজ কিছু হয় না। শুধু লিখো:

৪৪- ৪৪

“এখানে চারটি চার আছে, যার মান শূন্য।“

“তুমি কি এক পেতে চাও? সবচেয়ে সহজ উপায় হলো:

$$\frac{৪৪}{৪৪}$$

“৪৪কে ৪৪ দিয়ে ভাগ দিলেই কেল্লা ফতে!”

“দুই বানাতে চাইলেও চারটি চার দিয়ে সহজেই লেখা যায়:

$$\frac{৪}{৪}+\frac{৪}{৪}$$

“দেখতেই পাচ্ছো, ভগ্নাংশ দুটির যোগফল ২।

“তিন তো আরও সোজা। শুধু এভাবে লিখতে হবে:

$$\frac{৪+৪+৪}{৪}$$

এখানে লবের যোগফল ১২, যাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলেই ৩ পাওয়া যায়।

“কিন্তু ৪ বানাবে কীভাবে?” আমার প্রশ্ন

“এর চেয়ে সহজ আর কিছু হয় নাকি?” বেরেমিজের উত্তর। “৪ তো অনেকভাবেই পাওয়া যায়। একটা দেখাচ্ছি:

$$৪+\frac{৪-৪}{৪}$$

দেখতেই পাচ্ছো, দ্বিতীয় পদের মান শূন্য। তারমানে রাশিটির মান ৪ + ০ = ৪।

দেখলাম, সিরীয় ব্যবসায়ী মনোযোগ দিয়ে বেরেমিজের কথা শুনছে। চার চারের সমাবেশ তাকে বেশ মুগ্ধ করেছে।

বেরেমিন বললেন, “পাঁচ বানাতে চাইলেও সমস্যা নেই।

$$\frac{৪\times৪+৪}{৪}$$

“ছয় লিখব এভাবে:

$$\frac{৪+৪}{৪}+৪$$

“একটু ঘুরিয়ে লিখলেই পাব ৭:

$$\frac{৪৪}{৪}-৪$$

“৮ বানানোও কোনো কঠিন কাজ নয়: ৪+৪-৪+৪

“৯ তো আরেক মজার সংখ্যা:

$$৪+৪+\frac{৪}{৪}$$

“এবার দেখাব দারুণ আরেক সংখ্যা:

$$\frac{৪৪-৪}{৪}$$

“আমরা পেয়ে গেলাম ১০।“

কুঁজো দোকানী[১] এতক্ষণ মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার কথা বলে উঠল, “বুঝলাম, আপনি অনেক ভাল একজন গণিতবিদ। দুই বছর আগে আমি একটি গাণিতিক সমস্যায় পড়েছিলাম। সেটা সমাধান করে দিতে পারলে আপনি যে নীল পাগড়িটা কিনতে চাচ্ছেন তা আপনাকে উপহার দেব।“

এরপর দোকানদার সমস্যাটা বললেন।

“একবার মদিনার এক শেখ ও মিশরের কায়রোর এক লোককে ৫০ দিনার করে ধার দিয়েছিলাম। তিনি চার কিস্তিতে সেটা পরিশোধ করেন: ২০, ১৫, ১০, ৫। মানে এভাবে:

পরিশোধিত অর্থ	বাকি থাকল
২০	৩০
১৫	১৫
১০	৪
৫	০
মোট ৫০	মোট ৫০

“দেখুন পরিশোধিত অর্থ ও বাকি ঋণের যোগফল ৫০। আবার কায়রোর লোকটাও ৫০ দিনারই পরিশোধ করেছে। তবে কিস্তির পরিমাণ ছিল ভিন্ন:

পরিশোধিত অর্থ	বাকি থাকল
২০	৩০
১৮	১২
৩	৯
৯	০
মোট ৫০	মোট ৫১

“দেখুন প্রথম যোগলফটা ৫০। ঠিক আছে। কিন্তু অন্য যোগফলটি ৫১। এমন তো হওয়ার কথা নয়। এই কিস্তিগুলোর দ্বিতীয় অংশের যোগফলে বাড়তি ১ কোত্থেকে এল আমি বুঝতে পারছি না। জানি আমাকে ঠকানো হয়নি। আমি তো আমার পুরো ৫০ দিনারই পেয়েছি। কিন্তু ১ টাকার গড়বড় কীভাবে যে হলো?”

“বন্ধু,” বেরেমিজ শুরু করলেন, “অল্প শব্দেই এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাকি থাকা অর্থের সাথে মোট ঋণের কোনো সম্পর্ক নেই। ধরো ঋণ শোধ করা হয়েছে তিন কিস্তিতে: ১০, ৫ ও পরে ৩৫। তাহলে অবস্থাটা হবে এমন:

পরিশোধিত অর্থ	বাকি থাকল
১০	৪০
৫	৩৫
৩৫	০
মোট ৫০	মোট ৭৫

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম যোগফল ৫০। অন্য দিকে বাকি থাকা অর্থের যোগফল ৭৫। এটা আসলে যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে। ৮০, ৯০, ১০০, ২৬০, বা ৮০০ ইত্যাদি যে কোনো সংখ্যা। ঘটনাগ্রমেই কোনো একবার ৫০ হয়ে যেতে পারে।“

দোকানী সন্তুষ্ট।[২] তিনি প্রতিশ্রুতিটা রাখলেন। বেরেমিজকে ৪ দিনারের পাগড়িটা উপহার দিয়ে দিলেন।

অনুবাদকের নোট

১। ইন্টারনেটে Four Fours লিখে সার্চ দিলেই পরবর্তী সংখ্যাগুলো তৈরির দারুণ সব পদ্ধতি পাওয়া যাবে।

২। বাকি থাকা অর্থের যোগফল আসলে অর্থহীন একটা কাজ। দেখতে হবে বাকি থাকা ঋণের পরিমাণ শূন্য (০) হলো কি না। শূন্য হয়ে গেলেই বুঝতে

হবে আর কোনো ঋণ বাকি নেই। ১ টাকা করে পরিশোধ করতে থাকলে তো বাকি ঋণের পরিমাণ হবে ৪৯, ৪৮, ৪৭, ... ইত্যাদি। এগুলোকে যোগ করা অর্থহীন।

০৮

সপ্তম আকাশ

> বেরেমিজের জ্যামিতিতে ডুব। শেখ সালিম নাসির ও তাঁর মেষপালক বন্ধুদের সাথে আলাপ। বেরেমিজের ২১টি পানপাত্রের সমস্যার সমধান। হারানো দিনারের সমাধান।

সিরীয় ব্যবসায়ী থেকে সুন্দর উপহার পেয়ে বেরেমিজ খুব খুশী। বললেন, "জিনিসটা খুব ভালোভাবে বানানো হয়েছে।" সব দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন পাগড়িটা। "তবে একটা খুঁত আছে এতে, যা সহজেই এড়ানো যেত। এর আকৃতিটা জ্যামিতিকভাবে সঠিক নয়।"

তাঁর দিকে ঘুরে তাকালাম। বিস্ময় লুকোতে ব্যর্থ হলাম। মৌলিক চিন্তার অধিকারী লোকটা সবকিছুকেই জ্যামিতি দিয়ে চিন্তা করার উপায় বের করে ফেলত। এখন পাগড়িকেও জ্যামিতির চোখে দেখছে।

"বন্ধু, আমি জ্যামিতিক আকৃতি মেনে চলা পাগড়ি চাই বলে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।" বললেন পারস্যের পণ্ডিত। "সবকিছুতেই জ্যামিতি আছে। বিভিন্ন জিনিসের সাধারণ ও নিখুঁত আকৃতির দিকে তাকাও। ফুল, পাতা ও অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে প্রতিসাম্য দেখা যায় তার দিকে একবার তাকাও। আবারও বলছি, জ্যামিতি আছে সবখানে। আছে গোল সূর্যে, আছে পাতায়, রংধনুতে, প্রজাপতিতে, হীরায়, তারামাছ ও এমনকি ক্ষুদ্র বালুকণায়ও। প্রকৃতিতে অসীম রকম ভিন্ন ভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি আছে। বাতাসে উড়ে চলা কাক এর দেহকে নিয়ে যায় দারুণ এক রেখা বরাবর। উটের শিরায় বয়ে চলা রক্তও কঠোর জ্যামিতিক নীতি মেনে চলে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এর অনন্য কুঁজ অসাধারণ এক উপবৃত্ত (ellipse)। শিয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারা পাথর বাতাসের সুন্দর এক রেখা ধরে চলে, যার নাম পরাবৃত্ত (parabola)। মৌমাছি বাসা বানায় ছয় কোণার প্রিজম দিয়ে দিয়ে। এই জ্যামিতিক আকৃতির মাধ্যমে সে সবচেয়ে পরিমিতভাবে উপাদান ব্যবহার করে।

জ্যামিতি আসলে সবখানে আছে। তবে সেটা দেখার জন্যে চোখ প্রয়োজন। বোঝার জন্যে বুদ্ধি প্রয়োজন। বিস্মিত হতে চাই সে রকম চেতনা। সাদাসিধে বেদুইনরা এসব জ্যামিতিক আকৃতি দেখে। কিন্তু বোঝে না। সুন্নিরা সেগুলো বোঝে, কিন্তু মূল্য দেয় না। তবে শিল্পীরা চিত্রগুলোর চমকারিত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। শৃঙ্খলা ও ঐকতান দেখে বিমোহিত হন। আল্লাহ হলেন মহান জ্যামিতিক। তিনি বেহেশত ও দোজখকে জ্যামিতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন। পারস্যে একটি গাছ আছে, যা উট ও ভেড়ার খাবার হিসেবে খুব জনপ্রিয়। এর বীজ..."

এভাবে তিনি একের পর একে জ্যামিতির সৌন্দর্য বর্ণনা করে গেলেন। বণিকদের জায়গা থেকে থেকে দীর্ঘ বালিময় রাস্তা ধরে যেতে যেতে বিজয়সেতুতে পৌঁছলেন তিনি। আমি মুগ্ধতার সাথে তাঁকে নীরবে অনুসরণ করলাম।

আমরা মুয়াজ্জিন চত্বর পার হলাম। জায়গাটার অপর নাম উটচালকদের আশ্রয়স্থল। সাত দুঃখ নামের সরাইখানা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। বেদুইন এবং দামেশক ও মসুলের মুসাফিররা গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচতে হরহামেশা এতে আশ্রয় নেয়। এর সবচেয়ে রুচিশীল দিক ছিল ভেতরের উঠোনটা। গরমে এতে ভাল ছায়া পাওয়া যায়। এর চারদিকের দেয়াল লিবিয়ার পাহাড়ে জন্মানো সব ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে আচ্ছাদিত। জায়গাটায় এলেই মন স্বস্তি ও শান্তিতে ভরে ওঠে।

কাঠের একটি পুরনো সাইনপোস্ট চোখে পড়ল, যার পাশে বেদুইনরা উট বেঁধে রাখে। পোস্টে লেখা:

সাত দুঃখ সরাইখানা

"সাত দুঃখ, "বেরেমিজ বিড়বিড় করলেন। "কী আশ্চর্য! তোমার কি কোনোভাবে এই সরাইখানার মালিককে চেন?"

"আমি তাকে ভালোভাবেই চিনি।" উত্তর দিলাম। "সে ত্রিপলির একজন সাবেক দড়ি বেপারি। তার বাবা সুলতান কুরবানের অধীনে চাকরি করত। মানুষ তাকে ত্রিপলীয় বলে ডাকে। তার সরল ও অকপট মনের কারণে সবাই তাকে ভাল চোখে দেখে। ভাল এবং দয়ালু একজন মানুষ। তিনি নাকি একদল সফল সৈনিক নিয়ে সুদান গিয়েছিলেন। আফ্রিকান অঞ্চল থেকে পাঁছজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস নিয়ে আসেন। এরা তাঁর অত্যন্ত অনুগত। সুদান থেকে ফিরে তিনি দড়ির ব্যবসা ছেড়ে দেন। পাঁচ দাসকে নিয়ে গড়ে তোলান সরাইখানা।

"দাসগুলোর ছাড়াই তিনি নিজেই দারুণ সৃজনশীল।" বেরেমিজ বললেন। "তিনি তার সরাইখানার নামের মধ্যে ৭ সংখ্যাটি রেখেছেন। আর মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক–সবার কাছে ৭ একটি পবিত্র সংখ্যা। এটা ৩ ও ৪-এর যোগফল, যারা যথাক্রমে স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রতীক। বিভিন্ন বস্তুর সাথে ৭-এর বিস্ময়কর সম্পর্ক আছে:

দোযখের দরজা সাত
দিনের সংখ্যা সাত
গ্রিসে ছিলেন সাত জ্ঞানী
পৃথিবীর বুকে সাগর আছে সাত
গ্রহের সংখ্যা সাত[১]
পৃথিবীর আশ্চর্য সাত

পবিত্র সংখ্যাটির আরও নানান উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন গণনাকারী। হঠাৎ দেখলাম, সরাইখানার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মহান বন্ধু সালিম নাসির। আমাদেরকে ভেতরে যেতে হাত নাড়ছে।
"এই মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে আমি কত খুশি তা বলে বোঝাতে পারব না।" বললেন শেখ। "আমি ও আমার এখানের তিন বন্ধুর জন্যে আপনাকে যেন স্বয়ং আল্লাহ এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসুন এখানে। আমরা বড় এক সমস্যায় আছি।"
তিনি আমাদেরকে একটি ছায়াচ্ছন্ন, সেঁতসেঁতে ও উজ্জ্বল বারান্দা দিয়ে ভেতরের উঠোনে নিয়ে আসলেন। এতে পাঁচ কি ছয়টা টেবিল আছে। সেগুলোর একটিতে তিনজন মুসাফির বসা।

শেখ ও গণনাকারীকে দেখে তারা হাত তুলে সালাম দিল। তাদের একজনের বয়স খুব কম। দেখতে লম্বা, হালকা শরীরের। চোখ উজ্জ্বল। মাথায় উজ্জ্বল হলুদ পাগড়ি। পাগড়ির চারদিক সাদা ফিতে দিয়ে বেষ্টিত। পাগড়ির ফিতায় অনিন্দ্য সুন্দর একটি পান্না জ্বলজ্বল করছে। বাকি দুজন গাট্টাগোট্টা। চওড়া কাঁধ। আফ্রিকান বেদুইনদের কালো ত্বক। পোশাক ও বেশভূষা তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তারা গভীর আলোচনায় ডুবে ছিল এতক্ষণ। বোঝাই যাচ্ছে, কোনো সমধানের অভাবে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে আছে।

শেখ তাদেরকে বললেন, "এই হলেন বিখ্যাত হিসাব-রাজা।" আর বেরেমিজকে বললেন, "এরা তিনজন আমার বন্ধু। এরা দামেশকের মেষপালক। আমার দেখা অন্যতম অদ্ভুত এক সমস্যা তাদের সামনে। বাগদাদে এসে কিছু ভেড়া বিক্রি করে তারা উন্নত মানের কিছু শরবত পেয়েছে। সেগুলো দেওয়া হয়েছে ২১টি একইরকম দেখতে পানপাত্রে:

৭টি পানপাত্র পরিপূর্ণ

৭টি অর্ধপূর্ণ

৭টি একদম খালি

তারা এগুলোকে এমনভাবে ভাগ করতে চায় যাতে সবাই সমান শরবত পায়। পানপাত্রও যাতে সবাই সমানসংখ্যক পায়। পানপাত্রের সংখ্যাকে তো ভাগ করা সহজ। সবাই ৭টি করে পাবে। কিন্তু শরবত না ঢেলে কীভাবে সমানভাবে ভাগ করবে? গণনাকারী বন্ধু, এর কি কোনো সমাধান দেওয়া সম্ভব?”

বেরেমিজ দুই-তিন মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন, “২১টি পাত্রকে সহজেই ভাগ করা যায়। সবচেয়ে সহজ সমাধানটা বলছি আমি।

প্রথমজন পাবেন

তিনটি পূর্ণ পাত্র

একটি অর্ধপূর্ণ পাত্র

তিনটি খালি পাত্র

মোট তাহলে পেলেন সাতটি পাত্র।

দ্বিতীয়জন পাবেন

দুইটি পূর্ণ পাত্র

তিনটি অর্ধপূর্ণ পাত্র

দুইটি খালি পাত্র

ইনিও সাতটি পাত্র পেলেন।

তৃতীয়জনও দ্বিতীয়জনের মতো পাবেন। আমার হিসাব অনুসারে সবাই সাতটি করে পাত্র পেয়েছেন। শরবতও পাবেন সমান পরিমাণ। ধরি প্রতিটি পূর্ণ পাত্র সমান দুই একক। আর অর্ধপূর্ণ পাত্র সমান এক একক। তাহলে আমার বণ্টন অনুসারে প্রথমজন পেলেন

২ + ২ + ২ + ১ + ০ + ০ + ০

মানে মোট ৭ একক।

আবার বাকি দুজন পাবেন

২ + ২ + ১ + ১ + ১ + ০ + ০

এতেও হয় ৭ একক। এতে দেখা গেল, আমার প্রস্তাবিত হিসাব ন্যায়ভিত্তিক হয়েছে। সমস্যাটিকে জটিল মনে হলেও এর সাংখ্যিক হিসাবে জটিলতা নেই।

গণনাকারীর সমাধানকে শেখ ও তিন বন্ধুর সাদরে গ্রহণ করলেন।

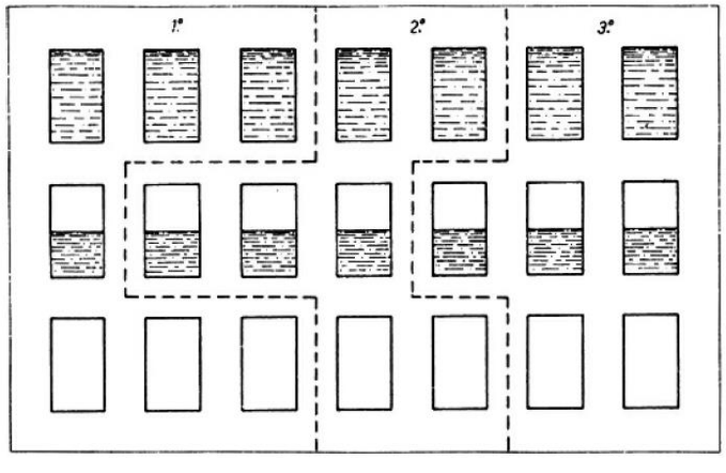

চিত্র: ২১টি পানপাত্রকে সবচেয়ে সরলভাবে বণ্টন করার উপায় দেখানো হয়েছে।

“ইয়াল্লা!” পান্নাখচিত পাগড়ি পরা তরুণ লোকটি বলে উঠল। “এই গণনাকারী তো বিস্ময়কর মানুষ। আমাদের কাছে যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে হচ্ছিল তিনি তা নিমিষেই সমাধান করে দিলেন।“ সরাইখানার

মালিকের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে ত্রিপলির বাসিন্দা, আমাদের বিল কত হয়েছে?"

"খাবারসহ আপনাদের বিল হয়েছে ৩০ দিনার।" উত্তর দিলেন মালিক। শেখ নাসির বিল দিতে চাইলেন। কিন্তু দামেশকের মানুষ মানলেন না। এটা নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও প্রশংসা বিনিময় হলো। সবাই একযোগে কথা বলে গেল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, অতিথি শেখ নাসির বিল দিতে পারবেন না। তিন বন্ধু ১০ দিনার করে দেবেন। মালিকের সুদানি দাসের হাতে ৩০ দিনার দেওয়া হলো।

একটু পরে দাস ফিরে এসে বলল, "আমার মনিব বলেছেন তিনি একটা ভুল করেছেন। বিল হয়েছে ২৫ দিনার। আপনাদেরকে ৫ দিনার ফিরিয়ে দিতে বলেছেন।

"ত্রিপলির মানুষটা সত্যিই ভাল।" শেখ নাসির বললেন। পাঁচটি মুদ্রা নিয়ে তিনি তিন বন্ধুর প্রত্যেককে একটি করে মুদ্রা দিলেন। বাকি থাকলে দুটি মুদ্রা। দামেশকের তিন লোকের দিকে এক পলক দৃষ্টি বিনিময় করে তিনি ২টি মুদ্রা তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা সুদানি দাসকে বখশিশ দিলেন।

এ সময় পান্নাওয়ালা তরুণটি দাঁড়িয়ে গেলেন। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "৩০ দিনারের বিল দিতে গিয়ে মারাত্মক এক সমস্যা হয়ে গেছে।

"সমস্যা? আমি তো কোনো সমস্যা দেখি না।" শেখ বিস্মিত।

"আচ্ছা, বলছি।" দামেশকের বাসিন্দা বললেন। "সমস্যাটা মারাত্মক, তবে দেখে হাস্যকর মনে হবে। একটি দিনার হারিয়ে গেছে। একটু ভাবো। আমাদের সবাই ৯ দিনার করে বিল দিয়েছি। মানে মোট দিয়েছি ২৭ দিনার। এই ২৭-এর সাথে যোগ করলাম শেখ দাসকে যে ২ দিনার বখশিশ দিয়েছেন। তাহলে হলো ২৯ দিনার। আমরা মোট যে ৩০ দিনার দিলাম তার মধ্যে মাত্র ২৯ দিনারের হদিশ মিলল। তাহলে আরেকটি দিনার কোথায়? সেটা কোথায় হারিয়ে গেল?"

শেখ নাসির একটু ভাবলেন। "তুমি তো ঠিকই বলেছ, বন্ধু। তাই তো! প্রত্যেকেই ৯ দিনার দিয়ে থাকলে আর দাস ২ দিনার পেলে তো ২৯ দিনার হয়। মূল ৩০ থেকে ১ দিনার তো নেই।"

বেরেমিজ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার আর নাক না গলিয়ে পারলেন না। শেখকে বললেন, "আপনি ভুল করছেন। হিসাব এভাবে করা ভুল। ত্রিপলির লোকটাকে দেওয়া হয়েছিল ৩০ দিনার। ২৫ দিনার তার কাছেই থাকল। ৩ দিনার তিন বন্ধুর কাছে ফেরত গেছে। ২ দিনার দাস বখশিশ পেয়েছে। কিছুই হারায়নি। হিসাবেও কোনো গড়বড় নেই। তিন বন্ধুর মোট ২৭ দিনার খরচের ২৫ দিনার পেয়েছেন মালিক আর ২ দিনার পেয়ছে দাস।"

বেরেমিজের ব্যাখ্যা[২] শুনে দামেশকের তিন বন্ধু হাসিতে ফেটে পড়ল, "এই গণনামানব হারানো দিনারের রহস্যও বের করলেন। সরাইখানার মানও রক্ষা করেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া।"

অনুবাদকের নোট

১। সে সময় জানা গ্রহের সংখ্যা সাত ছিল। তবে বর্তমানে আট। যদিও প্লুটোকে অনেকদিন পর্যন্ত গ্রহ বলায় ৯টি ছিল অনেকদিন পর্যন্ত।

২। ব্যাপারটাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। শেখ নাসির ও তার বন্ধুটি যে ২৭-এর সাথে ২ যগ করলেন সেটা আসলে ভিন্ন রকম সংখ্যাকে যোগ করা হয়েছে। গত অধ্যায়ের ভুল যোগটির মতো। ৫টি আম আর ২টি লিচুকে যোগ করলে কয়টি আম হয় বলা অযৌক্তিক। বললে আলাদাভাবেই বলতে হবে: ৫টি আম ও ২টি লিচু।

০৯

শিক্ষকের শিক্ষক

কবি শেখ ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ। একজন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর অদ্ভুদ ফলাফল। একজন কিশোরীকে গণিত পড়ানোর প্রস্তাব পেলেন বেরেমিজ। বেরেমিজ তাঁর বন্ধু ও মনিব জ্ঞানী ইলিম সম্পর্কে বলছেন।

মহররম মাসের শেষ সূর্যোদয়। বিখ্যাতি কবি ইয়াজিদ আব্দুল হামিদ আমাদেরকে খুঁজতে মুসাফিরখানায় এলেন।

"নতুন কোনো সমস্যা নাকি?" বেরেমিজ হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিকই ধরেছেন, বন্ধু। "কঠিন এক সমস্যায় পড়েছি। আমার তেলাসসিম নামে একটি মেয়ে আছে। ওর বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি। পড়াশোনায়ও ব্যাপক আগ্রহ। আমি চাই ও সংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও তাদের বিভিন্ন কার্যকরী সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করুক। কিন্তু সংখ্যা ও হিসাবের দক্ষতা অর্জন করতে হলে আল-খাওয়ারিজমির বিজ্ঞান, মানে গণিত জানতে হবে। এ কারণে আমি ঠিক করেছি তেলাসসিমের ভবিষ্যৎকে সুখময় করতে তাকে জ্যামিতি ও ক্যালকুলাসের রহস্য শেখাব।"

নম্র শেখ একটু থামলেন। এরপর বললেন, "আমি দরবারে অনেক পণ্ডিত খুঁজেছি। কিন্তু সতের বছর একটি মেয়েকে জ্যামিতি পড়ানোর মতো কাউকে পাইনি। তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাধর একজন পণ্ডিত আমাকে উল্টো বললেন, "আপনি কি জিরাফকে গান শেখাতে চাইবেন? এর স্বরতন্ত্রী ন্যূনতম শব্দটিও করতে পারে না। এটা হবে সময়ের মারাত্মক অপচয়। পণ্ডশ্রম। জিরাফ কখনোই গান গাইবে না।

আর নারী মস্তিষ্কও তো জ্যামিতির প্রাথমিক নিয়মগুলোই বুঝবে না। এই অনন্য বিজ্ঞানটি যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবহার করতে হয় নানান রকম সমীকরণ। এছাড়াও যুক্তি ও অনুপাত ব্যবহার করে বিভিন্ন নীতিমালা প্রয়োগ করতে হয়। বাবার হেরেমে আবদ্ধ একটি মেয়ে কীভাবে বীজগণিতের সূত্র ও জ্যামিতির উপপাদ্য শিখবে? কখনোই না। একটি তিমিও মক্কায় হজ্ব করতে যাওয়ার চেয়ে একটি মেয়ের গণিত শেখা কঠিন। কেন অসম্ভব নিয়ে মেতে আছেন? দুর্ভাগ্য যদি এসেই যায়, তাকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মেনে নিন।"

এ মুহূর্তে শেখ খুব গম্ভীর। কুশন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ হাঁটলেন একটু। একটু পর আরও বিষন্ন হয়ে বললেন, "এসব কথা শুনে আমার মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। তবে একদিন বন্ধু সালিম নাসিরের কাছে বাগদাদে আসে পারস্যের এক গণিতবিদ সম্পর্কে অনেক কথা শুনলাম। খুব বিস্তারিত শুনলাম আট রুটির গল্প। অনেক মুগ্ধ আমি। তাই গণনাকারী খুঁজে পেতে আমি বের হয়ে পড়লাম। তাঁকে খোঁজার জন্যে উজির মালুফের বাসায়ও গিয়েছি। ২৫৭টি উটের সমস্যা তিনি কত সৃজনশীল উপায়ে সমাধান করেছেন দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। অপূর্ব উপায়ে তিনি ২৫৭টির বদলে ২৫৬টি উটের প্রস্তাব দেন। আপনাদের মনে আছে না?"

শেখ ইয়াজিদ মাথা তুলে শ্রদ্ধার সাথে গণনাকারীর দিকে তাকালেন, "হে বন্ধু, আপনি কি আমার মেয়ে তেলাসসিমকে গণিতের কৌশলগুলো শেখাতে পারবেন? আপনি যত বিনিময় চান আমি দেব। আপনি উজির মালুফের সচিবের দায়িত্ব পালন করেও পড়াতে পারবেন।"

"শ্রদ্ধেয় শেখ, "বেরেমিজ সাথে সাথে জবাব দিলেন, "আপনার সুন্দর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ পাচ্ছি না। কয়েক মাসের মধ্যে আমি আপনার মেয়েকে বীজগণিত ও জ্যামিতির রহস্য শিখিয়ে দিতে পারি। মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা সম্পর্কে দার্শনিকরা মারাত্মক ভুলের মধ্যে আছেন। সঠিক নির্দেশনা পেলে নারীদের বুদ্ধিমত্তাও বিজ্ঞানের সৌন্দর্য ও রহস্য আয়ত্ত করতে পারবে। তথাকথিত সেসব পণ্ডিতদের ধারণার ভুল

সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যাবে। ইতিহাসে মহিলাদের গণিতে দক্ষতার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন আলেক্সান্দ্রিয়ার হাপেশিয়ার কথা বলা যায়। যিনি শত শু মানুষকে গাণিতিক বিজ্ঞান শিখিয়েছিলেন। ডায়াফ্যান্টাসের কাজের ওপর একটি বিশ্লেষণ লিখেছেন। অ্যাপোলোনিয়াসের কঠিন কঠিন লেখার বিশ্লেষণ লিখেছেন। বর্তমানে ব্যবহৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারণি সংশোধন করেছেন। শেখ, ভয় পাবেন না। অনিশ্চয়তায়ও ভুগবেন না। আপনার মেয়ে পিথাগোরাসের জ্ঞান সহজেই আয়ত্ত করবে। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। এখন ঠিক করতে হবে কবে কখন পড়ানো শুরু করব।“

ইয়াজিদ সাহেব বললেন, “যত দ্রুত সম্ভব! তেলাসসিমের বয়স সতেরো হয়ে গেছে। ও, আপনাকে একটি বিষয় বলে দেই। আমার মেয়ে হেরেমেই থাকে। আজ পর্যন্ত ও আমাদের পরিবারের বাইরে কারও সাথে কথা বলেনি। সে গণিতের ক্লাস করবে পর্দার ওপাশ থেকে। তার চেহারা ঢাকা থাকবে। দুজন দাস আশেপাশে থাকবে। এসব শর্তে আপনার আপত্তি নেই তো?”

“আনন্দের সাথেই মেনে নিচ্ছি।“ বেরেমিজ উত্তর দিলেন। “একটি মেয়ের সম্ভ্রম ও শালীনতা বীজগণিতের সূত্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে। দার্শনিক প্লেটোর স্কুলের দরজায় লেখা ছিল

জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।

একদিন নষ্ট চরিত্রের এক যুবক প্লেটোর স্কুলে আসল। কিন্তু তিনি তাকে ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, ‘জ্যামিতি সরল ও বিশুদ্ধ। এমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তোমার নোংরামীর কাছে নিরাপদ নয়।‘

এভাবেই সক্রেটিসের বিখ্যাত ছাত্র দেখিয়ে দিলেন, গণিত আর নোংরামী সমান্তরালে চলে না। অশ্লীলতার সাথে মিশ্রিত করলে এর সম্মান নষ্ট হয়। আমার কাছে অচেনা আপনার মেয়েকে আমি আনন্দের সাথেই পড়াব। তাকে আমি চিনি না। তার চেহারাও আমার দেখার দরকার হবে না। আল্লাহ চাহে তো আমি কালই শুরু করতে পারব।“

“আচ্ছা ঠিক আছে,“ বললেন শেখ। “জোহরের সালাতের কিছু পরে আমার একজন দাস আপনাকে নিয়ে আসতে যাবে। আল্লাহ হাফেজ।“

শেখ ইয়াজিদ চলে গেলে আমি গণনাকারীকে বললাম কাজটা মনে হয়ে তার জন্য ঠিক হবে না। তাঁকে বললাম, “যেখানে আপনি জীবনে কোনোদিন বই পড়েননি বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের পাঠচক্রে যাননি, সেখানে কীভাবে একজন কিশোরীকে আপনি গণিত পড়াবেন? আপনি যে সুন্দর ও প্রাসঙ্গিকভাবে হিসাব-নিকাশের ক্ষমতাকে কাজে লাগান তা কীভাবে শিখেছেন? আমি ভালোভাবে জানি, আপনি মেষপালক থাকার সময় ভেড়া, ডুমুর গাছ ও উড়ন্ত পাখির ঝাঁক থেকে গণনার রহস্য রপ্ত করেছেন...”

“বন্ধু, ভুল হচ্ছে তোমার।“ বেরেমিজ শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন। পারস্যে আমার মনিবের মেষ দেখাশোনার সময় ইলিম নামে একজন দরবেশকে একবার ভয়াবহ ধুলিঝড়ের সময় আমি তার প্রাণ রক্ষা করি। সে থেকে তিনি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি প্রয়োজনীয় ও দারুণ সব জিনিস শিখি। এমন একজন মানুষের শিষ্য হওয়ায় আমি জ্যামিতি পড়াতে পড়াতে আলেক্সান্দ্রিয়ার ইউক্লিডের শেষ বইটি পর্যন্ত যেতে পারব।

১০

হাতে পাখি

আমাদের ইয়াজিদের প্রাসাদে গমন। বদমেজাজি তারা তির বেরেমিজের হিসাবকে সন্দেহের চোখে দেখে। খাঁচার পাখি ও

পারফেক্ট সংখ্যারা। গণনাকারী শেখের দয়ার প্রশংসা করেন। আমি একটি কোমল ও সুরেলা গান শুনি।

বিকাল চারটার কিছু পরে আমরা সরাইখানা থেকে বের হয়ে ইয়াজিদ আব্দুল হামিদের বাড়ির পথ ধরলাম। ভদ্র ও বুদ্ধিমান একজন দাস আমাদের সাথে। মুয়াসসান এলাকার রাস্তার সমীরণ গায়ে লাগিয়ে আমরা এগুচ্ছি। একটি পার্কের কেন্দ্রে অবস্থিত চমৎকার এক বাসভবনে পৌঁছলাম আমরা।

ইয়াজিদের বাড়ির সৌন্দর্যে বেরেমিজ বিস্মিত হলেন। পার্কের কেন্দ্রে ছিল রূপার একটি টাওয়ার। সূর্যের আলোরা সেখানে রংধনু সৃষ্টি করেছে। একটি বড় উঠোন পেরিয়ে লোহার গেটের ওপাশে প্রধান বাসভবন। চমৎকার কারুকাজ করা গেটে। ভেতরে রয়েছে আরও একটি উঠোন। এই উঠোনের কেন্দ্রে রয়েছে একটি দারুণ সাজানো-গোছানো বাগান। ভেতরের উঠোন বাসাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। একটিতে রয়েছে শোবার ঘরগুলো। অন্য পাশে রয়েছে উন্মুক্ত কক্ষগুলো। আর আছে অভ্যর্থনা কক্ষ, যাতে শেখ দার্শনিক, কবি ও মন্ত্রীদের সাথে আড্ডা দেন।

সাজানো-গোছানো হলেও শেখের প্রাসাদকে মলিন ও বিষন্ন লাগছিল। গ্রিলের জানালা দিয়ে ভেতরে না তাকালে কল্পনাই করা যাবে না কত সুন্দর শৈল্পিক জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ভবনের দুইটি অংশ একটি লম্বা গ্যালারি দিয়ে যুক্ত। শ্বেত মার্বেল পাথরের চিকন দশটি পিলার গ্যালারিকে ধরে রেখেছে। পিলারের ফাঁকে ফাঁকে চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর অশ্বখুরাকৃতির খিলান। আর মেঝেটা মোজাইক নির্মিত। এখান থেকে দুটি শ্বত পাথরেরই দুটি সিঁড়ি একটি বাগানের দিকে নেমে গেছে। বাগানের পুকুরটির পাড়ে সব রং ও গন্ধের ফুল লাগানো রয়েছে। বাগানে একটি বড় পাখির খাঁচাও দেখা যাচ্ছে। এটাও মোজাইক দিকে সাজানো। এটিই যেন বাগানের মূল আকর্ষণ। অদ্ভুত ডাকের ও প্রজাতির এবং উজ্জ্বল পালকবিশিষ্ট পাখি আছে খাঁচায়। অপরূপ সুন্দর কিছু পাখি আমার অচেনা প্রজাতির।

মেজবান বাগান থেকে বেরিয়ে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিবাদন জানালেন। সাথে একজন কালো, চিকন ও চওড়া বুকের যুবক। বোঝা গেল, তার মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাব আছে। কব্জির খঞ্জর নিয়ে আনমনেই খেলছে সে। খঞ্জরের মুষ্ঠি হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। তার কথা বলার তীক্ষ্ণ, আগ্রাসী, রূঢ় ল কর্কশ ভাবটা সবচেয়ে বেশি বিশ্রী লাগে।

“এই লোকই কি আপনার সেই গণনাকারী?” তার কণ্ঠ অবজ্ঞা ঝরে পড়ল। “ইয়াজিদ, তুমি মানুষকে এত সহজে বিশ্বাস করে ফেল! তুমি রাস্তার ভিখারিকে সুন্দরী তেলাসসিমের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছ? এর কোনো অর্থ হয় না। হায় আল্লাহ! কেমন একটা কাঁচা লোক তুমি!” তার কণ্ঠে বিশ্রী হাসি।

তার ধৃষ্টতা আমাকে রাগিয়ে দিল। এক ঘুসি মেরে হতভাগার রূঢ়তার জবাব দিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বেরেমিজ কিন্তু একদম শান্ত। কে জানে? হয়তো বা গণনাকারী এই পরিস্থিতির মধ্যেও, এই অপমানের মধ্যেও আরেকটি সমস্যা পেয়ে গেছে সমাধানের জন্যে।

কবি এই লোকটির আচরণে বিব্রত হলেন। বললেন, “হে গণিতবিদ, দয়া করে আমার চাচাত ভাই তারা তিরের কর্কশ আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ও আপনার গাণিতিক জ্ঞান সম্পর্কে জানে না। তাই বুঝতে পারছে না। সেও তেলাসসিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

“হ্যাঁ, আমি এই আগন্তুকের গাণিতিক দক্ষতা সম্পর্কে জানি না। খাবার ও আশ্রয়ের সন্ধানে কত উট বাগদাদের উপর দিয়ে চলে যায় তা জেনে আমি কী করব?” লোকটি বলল। এরপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ঘনঘন কথা বলতে লাগল, “ভাই, কয়েক মিনিটেই আমি প্রমাণ করে দিতে পারব তুমি এই অভিযাত্রী সম্পর্কে কত ভুলের মধ্যে আছ। তুমি অনুমতি দিলে আমি এই লোকের বিজ্ঞানের দৌড় থামিয়ে দিতে পারি। এ জন্য মসুলের এক পণ্ডিতের কাছে শেখা সামান্য কিছু কৌশলই যথেষ্ট।“

“আচ্ছা, ঠিক আছে। অনুমতি দিলাম।“ ইয়াজিদ মেনে নিলেন। “তুমি এখনই গণনাকারীকে প্রশ্ন করতে পারো বা কোনো সমস্যা উত্থাপন করতে পারো।“

“সমস্যা? কী জন্যে? তুমি কি খাঁচায় আবদ্ধ শিয়ালের জ্ঞানকে জ্ঞানীদের বিজ্ঞানের সমতুল্য মনে কর?” লোকটির ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া। আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি, এই অজ্ঞ দরবেশের মুখোশ খুলে দিতে কোনো সমস্যা উত্থাপন করার দরকার নেই। ফলাফল দেখানোর জন্যে আমি আমার মস্তিষ্ককে কষ্ট দেব না। দ্রুতই বলছি।“

বেরেমিজের দিকে শীতল ও কঠোর দৃষ্টি দিয়ে সে পাখির বড় খাঁচার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “হে পাখি গণনাকারী, বলো এই খাঁচায় কয়টা পাখি আছে?”

বেরেমিজ এক হাত আরেক হাতে রেখে বুকে রাখল। গভীর মনোযোগ দিয়ে খাঁচার ভেতরের এতগুলো পাখি দেখতে লাগল। আমার কাছে মনে হলো, খাঁচার মধ্যে উড়ে বেড়ানো এতগুলো পাখি গোণার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। পাখিগুলো প্রতি মুহূর্তে বসার জায়গা পরিবর্তন করছে।

সুনসান নীরবতা। কয়েক সেকেন্ড পরে গণনাকারী ইয়াজিদের দিকে ফিরলেন, “শেখ, আমার অনুরোধ, তিনটি পাখি এখুনি ছেড়ে দেওয়া হোক। তাহলে মোট সংখ্যা বলা সরল ও মজার হবে।“

তাঁর অনুরোধকে নিছক বোকামি মনে হলো। যুক্তি বলে যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পাখি গুণতে পারবে, সে তিনটা বেশি পাখিও গুণতে পারবে। এ অনুরোধ ইয়াজিদকে কৌতূহলী করে তুলল। তিনি খাঁচার রক্ষককে বেরেমিজের কথামতো পাখি ছাড়তে আদেশ দিলেন। মুক্ত হয়েই তিনটি হামিং বার্ড (গুঞ্জনপাখি) তীরের মতো আকাশের দিকে ছুটে গেল।

“এখন, “ বেরেমিজ সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন, “খাঁচায় ৪৯৬টি পাখি আছে।“

“অপূর্ব!” ইয়াজিদের কণ্ঠে তীব্র উৎসাহ। “একদম সঠিক। তারা তিরও তা জানে। আমি তাকে বলেছি এখানে ৫০০টি পাখি ছিল। একটি নাইটিংগেইল আমি মসুল পাঠিয়েছি। তিনটি পাখি মুক্ত। বাকি থাকল ৪৯৬।“

“ভাগ্যক্রমে আন্দাজে বলা সংখ্যাটা মিলে গেছে।“ কণ্ঠে অসন্তোষ নিয়ে বিড়বিড় করল তারা তির।

কৌতূহলী ইয়াজিদ জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ৪৯৬কে কেন বেছে নিলেন? সাথে ৩ যোগ করে ৪৯৯ বলাই কি সহজ হত না?”

“আমি ব্যাখ্যা করছি, শেখ।“ বেরেমিজ উত্তর দিলেন। “গণিতবিদরা সবসময় মজার সংখ্যা পছন্দ করেন। আর সাদামটা ও নিরস সংখ্যা এড়িয়ে চলেন। ৪৯৯ ও ৪৯৬-এর পার্থক্য অল্পই। ৪৯৬ একটি পারফেক্ট বা নিখুঁত সংখ্যা। এ কারণেই একে আমি বেছে নিয়েছি।“

“নিখুঁত সংখ্যা দ্বারা আপনি কী বোঝাচ্ছেন? কিসে একটি সংখ্যাকে নিখুঁত করে তোলে?”

“নিখুত সংখ্যা হলো, “বেরেমিজ বললেন, “যে তার নিজে ছাড়া বাকি উৎপাদকগুলোর যোগফলের সমান হয়। যেমন ধরুন ২৮ এর নিজে ছাড়া বাকি উৎপাদকগুলো হলো ১, ২, ৪, ৭ ও ১৪। এদের যোগফল ২৮। তাহলে ২৮ একটি নিখুঁত সংখ্যা। ৬ সংখ্যাটিও নিখুঁত। ১ + ২ +৩ = ৬। ৬ ও ২৮ ছাড়াও ৪৯৬ও একটি নিখুঁত সংখ্যা।“

বদমেজাজি তারা তির বেরেমিজের ব্যাখ্যা আর সহ্য করতে পারল না। শেখ ইয়াজিদকে বলে রাগে গজর গজর করতে করতে বিদায় নিল। গণিতবিদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের চিহ্ন তার পায়ের ধুলিতে।

“আমি আবারও অনুরোধ করছি,” ইয়াজিদ সাহেব বললেন, “আমার ভাই তারা তিরের কথায় কষ্ট পাবেন না। ও খুব বদমেজাজি। আল দারিদের লবণের খনির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ও খিটখিটে ও কর্কশ হয়ে গেছে।

তিনবার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। দাসরা অনেকবার তার ওপর হামলা করেছে।“

বোঝাই যাচ্ছিল বিচক্ষণ বেরেমিজ শেখকে অসুবিধায় ফেলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বিনয় ও উদারতার সাথে বললেন, “প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বাস করতে হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করতে হয়। অপমানিতবোধ করলে আমি সুলাইমানের (আঃ) মতো বিচক্ষণ আচরণ করার চেষ্টা করি: “বোকার রাগ তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায়, কিন্তু একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি অপমান হজম করে নেয়” (বুক অব প্রোভার্ব ১২:১৬)। আমি কখনও আমার হৃদয়বান বাবার শিক্ষা ভুলব না। যখনই তিনি আমার মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিশোধপরায়ণতা দেখতেন, বলতেন, ‘যে সঙ্গী-সাথীদের সাথে নম্র আচরণ করে, আল্লাহ তাকে সম্মানীত করেন।‘ “

একটু থেমে তিনি বললেন, “তবে আমি অহঙ্কারী তারা তিরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি তার কল্যাণ কামনা করি। তার রুঢ় আচরণের ফলে আমি নতুন করে একটা কল্যাণমূলক কাজের চর্চার সুযোগ পেয়েছি।“

“নতুন কল্যাণমূলক কাজ?” শেখ অবাক। “কী বলছ?”

“একটি পাখি মুক্তি করলেই” বেরেমিজ জবাব দিলেন, “আমরা তিনটি কল্যাণমূলক কাজ করি। প্রথমটা হলো পাখিকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেওয়া। দুই আমাদের বিবেককে মুক্ত করা। আর তৃতীয়ত আল্লাহর প্রতি...“

“তাহলে তুমি বলছ আমি সবগুলো পাখি মুক্ত করে দিলে...”

“শেখ, আমি বলব,” বেরেমিজ উত্তেজিত হয়ে বললেন, “আপনি ১৪৮৮টি অতি উত্তম কল্যাণের কাজ করবেন।“ যেন তিনি অবচেতনভাবেই জানতেন ৪৯৬ ও ৩-এর গুণফল ১৪৮৮।

ইয়াজিদ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন তাঁর কথায়। তখনই ঠিক করলেন বিশাল খাঁচার সব পাখি ছেড়ে দিবেন। নির্দেশ শুনে দাস ও চাকররা হতবাক হয়ে গেল। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ও ধৈর্য্যের ফসল পাখিগুলোর মূল্য ছিল অনেক। ছিল তিতির পাখি, হামিং বার্ড, উজ্জ্বল লম্বা লেজের ফিজেন্ট, কালো শঙ্খ ছিল, মাদাগাস্কারের হাস, ককেশীয় পেঁচা, চীন ও ভারতের কিছু দুর্লভ আবাবিল পাখি।“

“মুক্ত করে দাও।“ অপূর্ব সুন্দর আংটিসহ হাতখানা দুলিয়ে শেখ চিৎকার করে বলে উঠলেন।

বিশাল দরজাগুলো নড়ে উঠল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে খাঁচা ছাড়ল। বাগানের গাছের ডালে গিয়ে বসল কিছু কিছু।

বেরেমিজ তারপর বললেন, “পাখা ছড়িয়ে রাখা প্রতিটি পাখি এক একটি বই, যার পৃষ্ঠাগুলো আকাশের বুকে উন্মুক্ত। পাখি বন্দী করা মানে আল্লাহর বইয়ের লাইব্রেরি ডাকাতি বা ধ্বংস করার মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া।“

আমরা এই প্রথম একটা গানের ধ্বনি শুনলাম। কণ্ঠটা ছিল অসাধারণ কোমল ও চিকন। আবাবিলের হালকা কিচিরমিচির ও ঘুঘুর কূজনের সাথে তা মিশে গেল। মোহনীয় ও বিষন্ন সুরে গান শুরু হলো। যেন কোনো নিঃসঙ্গ নাইটিংগেইলের শোকগাঁথা। ধীরে ধীরে গানের গলা চড়া ও কড়া হলো। বিকেলের শান্ত পরিবেশের সাথে গানের বিষন্নতাকে বেমানান লাগছিল। বাতাস যেভাবে পাতা উড়িয়ে নেয় সেভাবেই যেন গানের কলিকেও ভাসিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানের কণ্ঠ আবার পূর্বের শোকের সুর ধারণ করল। যেন বাগানের মধ্যে কেউ ফিসফিস করে বলছিল:

আমার কণ্ঠ হয় যদি গায়কের মতো

অথবা ফেরেশতার

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে

তাহলে আমার কণ্ঠ হবে

তামা বা পতলের ঝন ঝনের মতো

আমি শূন্য

আমি শূন্য

আমার যদি ভবিষ্যতের জ্ঞানও থাকে,

আমি যদি জানি সব রহস্য, সব জ্ঞান,

আমি যদি পাহাড়ও টলাতে পারি,

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে,

আমি শূন্য

আমি শূন্য

আমি যদি নিজেকে উড়াজ করে

আমার সব সম্পদ

গরীবকে বিলিয়ে দেই

আর আমার মধ্যে যদি দয়া না থাকে,

আমি শূন্য

আমি শূন্য

কণ্ঠের মোহনীয়তা আমাদের চারপাশকে আনন্দঘন করে তুলেছিল, যা বলে বোঝানো যাবে না। বাতাসও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

“তেলাসসিম গান গাচ্ছে।“ আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে দেখে বললেন শেখ।

পাখিরা দূরে উড়ে যাচ্ছিল। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মুক্তির গান। ৪৯৬টি পাখি তো নয়, যেন মনে হচ্ছিল হাজার হাজার।

বেরেমিজ চুপচাপ। গানের সুর তার চেতনায় মিশে গেছে। গানের সুর বাড়িয়ে দিয়েছিল পাখিদের মুক্তিতে আনন্দকে।

জিজ্ঞেস করলেন, “এই গান কে লিখেছে?”

শেখ বললেন, “আমি জানি না। এক খৃষ্টান দাস তাকে এটা শিখিয়েছে। এরপর থেকে সে এটা ভুলতেই পারছে না। এটা কোনো নাজরানী কবির লেখা হয়ে থাকবে। আমার স্ত্রী আমাকে এটা বলেছেন।

১১

সঠিক পরিমাপ

বেরেমিজ যেভাবে গণিত পড়ানো শুরু করলেন। প্লেটোর একটি কথা। আল্লাহর একত্ববাদ। পরিমাপ মানে কী? গণিতের বিভিন্ন অংশ। পাটিগণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব। বীজগণিত ও অন্বয় (সম্পর্ক)। জ্যামিতি ও আকৃতি। গতিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। রাজা আসাদ আবু কারিবের স্বপ্ন। আল্লাহর কাছে ‘অদৃশ্য’ শিক্ষার্থীর দোয়া।

বেরেমিজের পড়ানোর কক্ষটা বেশ বড়সড়। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো লাল মখমলের মোট ও ভারী পর্দা কক্ষকে দুই ভাগ করেছে। ছাদ উজ্জ্বল রং করা। পিলারগুলো সোনা-খচিত। গালিচার ওপর রেশমের বড় বড় কুশন ছড়িয়ে রয়েছে। কুশনের কিনারে কুরআনের আয়াত লেখা। দেয়ালগুলো সুন্দর নীল নকশায় সজ্জিত। মরুকবি আন্তারের কবিতার সুন্দর সুন্দর চরণ সেখানে লেখা। কক্ষের মধ্যখানে দুই পিলারের মাঝে নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে স্বর্ণাক্ষরে আন্তারের একটি বিজয়-সঙ্গীতের দুটি লাইন লেখা:

আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে ভালবাসলে

তাকে প্রেরণায় সিক্ত করেন

ধূপ ও গোলাপের গন্ধ পুরো ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে সন্ধ্যা নামছে। মর্মর পাথরের পালিশ করা জানালা খোলা। জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের সুন্দর আপেল গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। পাশেই বইছে ধূসর নদীর রুক্ষ স্রোত। দরজার কাছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী দাঁড়িয়ে। চেহেরা উন্মুক্ত। হাতের আঙ্গুলে মেহেদি দেওয়া।

“আপনার মেয়ে আছে?” শেখ বেরেমিজকে জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ, অবশ্যই,” শেখ উত্তর দিলেন। “আমি তাকে কক্ষের অন্যপাশে পর্দার আড়ালে বসতে বলেছি। ও ওখান থেকে দেখতে ও শুনতে পাবে। তবে এপাশ থেকে ওকে দেখা যাবে না।“

সত্যিই সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে বেরেমিজের ছাত্রী কিশোরী মেয়েটির ছায়াও দেখা না যায়। মেয়েটি হয়ত মখমলের কোনো ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে আমাদের দেখছে, যা আমরা বুঝতে পারছি না।

“আমার মনে হয়,” শেখ আবেগের সাথে বললেন, “এখন শুরু করা যেতে পারে। মা তেলাসসিম, মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো।“

“জি, বাবা।“ ওপাশ থেকে ভেসে এস একটি অভিজাত কণ্ঠ।

বেরেমিজ পাঠ শুরু প্রস্তুতি নিলেন। দুই পা আড়াআড়ি করে কক্ষের মাঝে একটি কুশনে বসলেন। আমিও কক্ষের কোণায় সুবিধামতো একটি জায়গায় আরাম করে বসলাম। শেখ বসলেন আমার পাশে।

বিজ্ঞানও শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। বেরেমিজও তাই করলেন: “পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের সর্বশক্তিমান স্রষ্টার জন্যে। আল্লাহর করুণাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমরা আপনারই উপাসনা করি। আপনার করুণা কামনা করি। আমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন, যে পথে চলেছেন আপনার আশীর্বাদপুষ্টরা।“

প্রার্থনা শেষ করে বেরেমিজ বললেন, “রাতের নীরব পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে আমরা অনুভব করি, আল্লাহর বিস্ময়কয় সৃষ্টি উপলব্ধি করার সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের বিস্মিত চোখে তারকারা যেন এক উজ্জ্বল কাফেলা, যারা চলছে এক অসীম মরুভূমি ধরে। ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য নীহারিকা, গ্রহ। মেনে চলছে চিরন্তন নিয়ম। মহাকাশের গভীর থেকে গভীরে চিন্তা করলে একটি ধারণাই ভেসে আসে: সর্বত্র সংখ্যার জয়জয়কার।

“গ্রিকরা যখন দেব-দেবীর পূজা করত সে সময়ের কথা। পিথাগোরাস নামে একজন দার্শনিকের জন্ম হলো। আল্লাহ কত জ্ঞানী! একজন শিষ্য পিথাগোরাসকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের কাজকর্মে সবচেয়ে প্রভাবশালী নিয়ামক কী, তিনি উত্তর দিলেন, ‘সংখ্যাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।‘

“সত্যিই, সবচেয়ে সরল চিন্তাটিও অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যার মৌলিক ধারণা ছাড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মরুর বেদুইন প্রার্থনায় মাথা ঝুঁকিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তার চেতনা জুড়ে থাকে একটি সংখ্যা: এক ও একত্ববাদ। হ্যাঁ, পবিত্র গ্রন্থ ও নবীর কথা অনুসারে আল্লাহ এক, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। ফলে আমাদের বুদ্ধির কাঠামোতে স্রষ্টার প্রতীক হিসেবে সংখ্যারা মিশে আছে।

“সকল যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তি হলো সংখ্যা। সংখ্যা থেকেই আসে আরেকটি সার্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: পরিমাপ।

“পরিমাপ করতে হলে তুলনা করতে হয়। শুধু সে সংখ্যাগুলোই পরিমাপ করা যায় যেগুলোতে তুলনা করার কোনো উপাদান থাকে। মহাশূন্যের বিশালতাকে কি পরিপাম করা সম্ভব? একদম না। মহাশূন্য অসীম। ফলে নেই তুলনার কোনো মাপকাঠি। অনন্ত সময়কে কি পরিমাপ করা সম্ভব? কখনোই না। মানুষের কাছে সময় সবসময় অসীম। আর অনন্ত কালের হিসেব করতে গেলে এত ক্ষণস্থায়ী কিছুকে পরিমাপের একক বানানো সম্ভব নয়।

“অনেক সময় অবশ্য একটি অসম্ভব পরিমাপকে অন্য মাত্রায় চিন্তা করলে নিশ্চয়তার সাথে হিসেব করা সম্ভব হয়। এতে পরিমাপ সরল হয়ে ওঠে। এই কৌশলটাই গাণিতিক বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।“

“এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে গণিতবিদকে সংখ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। তাদের বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস জানতে হয়। এর নাম পাটিগণিত। এটা জানা হয়ে গেলে সংখ্যাকে বিভিন্ন মাত্রার পরিমাণ নির্ণোয়ের জন্যে কাজে লাগানো যায়। প্রতীক ও সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত অজানা রাশির মান বের করা যায়। এভাবে আমরা পাই বীজগণিত। বাস্তবে আমরা যেসব জিনিস পরিমাপ করি তা জড় বস্তু বা প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করি। দুই ক্ষেত্রেই এই বস্তু বা প্রতীকগুলোর তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে: আকৃতি, আকার ও অবস্থান। এজন্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই জ্যামিতির কাজ।

“গতি ও বলকে নিয়ন্ত্রণকারী সূত্র নিয়েও গণিত কাজ করে। যেসব সূত্রের দেখা আমরা গতিবিদ্যায় (mechanics)। মানুষ তার সব বিস্ময়কর প্রতিভা আরও একটি বিজ্ঞানের পেছনে কাজে লাগিয়েছে। যেটি মানুষের চেতনার উৎকর্ষ ঘটায়। অবস্থানকে উন্নত করে। সেই বিজ্ঞানের নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান।

“কেউ কেউ মনে করেন, গণিতের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি একদম স্বতন্ত্র বিষয়। এটা বড় একটি ভুল ধারণা। সবগুলো শাখাই একাত্ম হয়ে কাজ করে। একে অন্যকে সহায়তা করে। কখনও কখনও তো একটির জায়গায় অন্যটি দিয়েই কাজ চালানো যায়।

“গণিত মানুষকে সরল ও বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। সব কলা ও বিজ্ঞানের ভিত্তি গণিত।

“তোমাকে আমি এক ইয়েমেনি রাজার একটি ঘটনা বলছি। ইয়েমেনের রাজা আসাদ আবু কারিব একদিন তার রাজপ্রাসাদের বিশাল বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সাতজন বালিকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মরুভূমির প্রখর রোদে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা থেমে দাঁড়াল। ঠিক তখনই সেখানে একজন রাজকুমারীকে দেখা গেল। তিনি একটি কলসি থেকে তাদেরকে পানি খেতে দিলেন। রাজকুমারী তাদের পিপাসা মিটিয়ে দিলে তারা আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে লাগল।

দূর্বোধ্য এই স্বপ্ন দেখে রাজা আবু কারিব অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। সানিব নামে একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সানিব বললেন, ‘হুজুর, পথে হেঁটে যাওয়া সাতজন বালিকা হলো স্বর্গীয় সাত শিল্পকলা ও মানব বিজ্ঞান: চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নির্মাণশিল্প, স্থাপত্যকৌশল, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন। তাদেরকে সহায়তা করা দয়ালু রাজকুমারী হলেন মহান গাণিতিক বিজ্ঞান।‘

‘গণিতের সাহায্য ছাড়া,’ জ্ঞানী লোকটি আরও বললেন, ‘শিল্পকলার উন্নতি হবে না। বিজ্ঞান ধ্বংস হয়ে যাবে।‘

এসব কথায় প্রভাবিত হয়ে রাজা সবগুলো শহর, গ্রাম ও মরুদ্যানে গণিত শিক্ষাদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজ আদেশ পেয়ে দক্ষ ও বাগ্মী পণ্ডিতরা বাজার, মুসাফিরখানা ও কাফেলায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ী ও যাযাবরদের পাটিগণিত শিক্ষা দিতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ আগের চেয়ে উন্নত হলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে দেশের

সত্যিকার সম্পদও সমৃদ্ধ হচ্ছিল। বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থী দিয়ে ভরপুর হচ্ছিল। বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটল। শৈল্পিক কাজের পরিধি বাড়ল। স্থাপনা তৈরি হলো। দুর্লভ ও বিদেশী সম্পদে শহরগুলো ভরে উঠল। ইয়েমেন দেশের উন্নতি ও প্রাচুর্যের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ বিপদ এল। কাজ ও সম্পদের মহান অগ্রগতি থেমে গেল। আত্মায়ী আসরাইলের হাতে খুন হয়ে রাজা আবু কারিব এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।